মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি
হযরতজীর হেদায়াত-১

মুফতী শরীফুল আজম

দাওয়াত ও তাবলীগের যে মেহনত আজ বিশ্বময় পরিচালিত হচ্ছে, শেষ যামানায় এটি একটি তাজদীদি আন্দোলন। ব্যাপক বিস্তৃতি সত্ত্বেও এই মেহনতের পদ্ধতির মাঝে মৌলিক কোনো তফাত পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিশ্বের নানা ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে পৌঁছা সত্ত্বেও এর পদ্ধতি, ধরন ও পরিভাষার স্বকীয়তা বহাল থাকার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে অনুকরণ। শুরু লগ্ন থেকে এই মেহনতের মাঝে মুরব্বিদের পদাঙ্ক অনুসরণ-অনুকরণের প্রতি জোর তাগিদ দেওয়া হতে থাকে। মুরব্বিদের আপসহীন মনোভাবের ফলে দুনিয়াব্যাপী সহীহ পদ্ধতিতে বিস্তার লাভ করে এই মেহনত। এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন প্রথম স্তরের চারজন মুরব্বি। ১। হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। ২. শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) ৩। হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ও ৪. হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)।

তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, নিরলস মেহনত আর এখলাসের বরকতে আজ বিশ্বের আনাচে-কানাচে মানুষ হেদায়াত লাভে ধন্য হচ্ছে। এ সকল মুরব্বির প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি, দিকনির্দেশনা বা হেদায়াত অনুকরণ যত দিন চলতে থাকবে, তত দিন তাঁদের রেখে যাওয়া এই মোবারক মেহনত সঠিকভাবে পরিচালিত হতে থাকবে। পক্ষান্তরে এ ব্যাপারে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে পুরো উম্মতকে এর খেসারত দিতে হবে। তাই এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত সকলের একান্ত কর্তব্য হবে প্রতিষ্ঠাতা মুরব্বিদের হেদায়াতের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এটাই হবে এই মেহনতের প্রতি প্রকৃত মহব্বত ও খায়েরখাহি।

বড়দের কর্মপন্থায় অবিচল থাকা :

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এই মেহনতের যে পদ্ধতি ও কর্মপন্থা সমকালীন বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের পরামর্শে ঠিক করেছেন, পরবর্তীতে দ্বিতীয় হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ.) ও তৃতীয় হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) সেই উসূলের ওপর অটল অবিচল থেকে পুরো দুনিয়াতে তাবলীগের মেহনত পরিচালনা করেন। এ থেকে এক চুল সরে আসাকে তাঁরা পছন্দ করতেন না। নতুন কিছু করার পরামর্শ এলে হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বলতেন

ہم تو لکیر کے فقیر ہیں اپنے بڑوں کو جس طرح کرتے دیکھا اسی طرح کریں گے (سوانح ۳/۱۸۲)

আমরা তো বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণে বাধ্য। তাঁদেরকে যেভাবে করতে দেখেছি হুবহু সেভাবেই করব। (সাওয়ানেহ মাওলানা এনামুল হাসান ৩/১৮৬)

একবার হযরতজী মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে এক ব্যক্তি ছয় নাম্বারের সাথে আরো দুটি নাম্বার যোগ করার পরামর্শ দিল। মজলিসে উপস্থিত মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) তার এ প্রস্তাব শুনে বলে উঠলেন, আমরা তো বড়দের রেখে যাওয়া উসূলের কাঙ্গাল। আমরা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর বাতলানো উসূল মোতাবেক দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাব এবং অন্যদের দিয়েও করাব ইনশাআল্লাহ। (সাওয়ানেহ)

আজ যারা সারা বিশ্বে দাওয়াত ও তাবলীগের ছোট-বড় বিভিন্ন জিম্মাদারী আদায় করছে প্রতিটি কদমে ওই চার মুরব্বির হেদায়াতের অনুসরণ তাদের একান্ত কর্তব্য। মুরব্বিদের বাতলানো পথ ছেড়ে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো দর্শন উপস্থাপনের চেষ্টা করা হলে এই মোবারক মেহনত হোঁচট খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেবে।

একটি ধোঁকা :

শয়তান মানব জাতির চির দুশমন। আদম সন্তানের কল্যাণ কিছুতেই সে সহ্য করতে পারে না। দাওয়াতের মেহনত দ্বারা যেভাবে দুনিয়াতে হেদায়াতের নূর ছড়াচ্ছে, ঠিক অপর দিকে ইবলিস শয়তানের গাত্রদাহের মাত্রাও এতে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সে নিজ সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে এই মেহনতের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তার সবচেয়ে ভয়াবহ চক্রান্ত হচ্ছে নেক সূরতে ধোঁকা। যেমন পূর্বে সে এক দল লোক তৈরি করেছিল যারা বলত আমরা পবিত্র কোরআন ছাড়া আর কিছু মানি না। তারা হাদীস মানতে অস্বীকৃতি জানাত। আহলে কোরআন বা মুনকিরে হাদীস নামে ওই দলটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। আরেক দল বের হয়েছে যারা বলে আমরা সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না। তাদের এ সকল কথা শুনতে ভালো লাগলেও এর ভেতর লুক্কায়িত আছে বিষ। উলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় এ সকল ফিতনার মুখোশ আজ গোটা উম্মতের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের মাঝে মুরব্বিদের রেখে যাওয়া উসূল বাদ দিয়ে সরাসরি সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের দর্শনও এমন একটি ধোঁকা। সাহাবাদের অনুসরণের কথাটি শুনতে খুব ভালো লাগলেও এর ভেতর কোনো বিষ আছে কি না, তা বুঝে ওঠা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মুরব্বিগণও তো সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণেই এই মেহনতের উসূল ও কর্মপন্থা ঠিক করেছিলেন। তাঁদের জীবনীতেই সাহাবাওয়ালা জিন্দেগীর নমুনা বেশি বিদ্যমান ছিল। তাঁদের মেহনত

সাহাবাওয়ালা মেহনতের নমুনায় সূচিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁদের কর্মপন্থা ও হেদায়াত মোতাবেক বেশি বেশি মেহনত ও কোরবানী পেশ করার প্রতি সচেষ্ট হতে হবে। এমনটি মনে করার অবকাশ নেই যে মুরব্বিগণ তাঁদের যুগে বিশেষ পদ্ধতিতে মেহনত করেছেন, আর এ যুগে আমরা সাহাবীদের আসল পদ্ধতিতে ফিরে এসেছি। বরং দেখতে হবে যে মুরব্বিদের চিন্তাচেতনা থেকে সরিয়ে এই মেহনতের সাথিদের মাঝে ভিন্ন কোনো মানসিকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা বা চক্রান্ত হচ্ছে কি না। আর সর্বদা হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর সেই অমূল্য বাণীটি সামনে রেখে চলতে হবে। তিনি বলেছিলেন, ہم تو لکیر کے فقیر ہیں (হাম তো লকীর কে ফকীর হ্যায়) আমরা তো বড়দের পদাঙ্কের কাঙ্গাল। এভাবে আকাবির মুরব্বিদের হেদায়াত মোতাবেক চলতে থাকলে ইনশাআল্লাহ এই মোবারক মেহনত সকল ফিতনা ও শয়তানি চাল থেকে নিরাপদ থাকবে এবং যুগ যুগ ধরে এর দ্বারা উম্মত উপকৃত হতে থাকবে।

ঈমানী আন্দোলন :

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) যে মেহনত চালু করে গেছেন তার সংজ্ঞা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন-

ہماری یہ تحریک درحقیقت تجدید ایمان اور تکمیل ایمان کی تحریک ہے۔

আমাদের এই আন্দোলন মূলত ঈমান সংস্কার ও পূর্ণাঙ্গরূপ দানের আন্দোলন। (মালফুযাত, পৃ. ১২৩)

তাঁর এ কথার মাঝে নিগূঢ় রহস্য লুক্বায়িত আছে। যার ব্যাখ্যা হাদীস গ্রন্থসমূহের কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। ঈমানের সংস্কার ও বিভিন্ন স্তর পার হয়ে পূর্ণাঙ্গরূপ দানের বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে। দাওয়াতের মেহনত মূলত ঈমানের ওই সকল স্তর পার করে একজন মানুষকে খাঁটি বান্দা হিসেবে তৈরি করার একটি নীরব বিপ্লব। শুধুমাত্র মসজিদভিত্তিক পাঁচ কাজের রুটিনওয়ার্ক করাই যথেষ্ট নয়। বরং দেখতে হবে ঈমানের মাঝে ধীরে ধীরে উন্নতি সাধন হচ্ছে কি না এবং পূর্ণাঙ্গরূপ লাভের প্রক্রিয়া চলমান আছে কি না।

ঈমানের স্তর :

মূল ঈমান এবং তাওহীদের মাঝে সকল মুসলমান এক ও বরাবর। তবে ঈমানের শক্তি কমবেশি হওয়ার দিক দিয়ে তাদের মাঝে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। কারণ ঈমান ও কুফরের উদাহরণ চক্ষুষ্মান এবং অন্ধের মতো। দৃষ্টিশক্তি যাদের আছে তাদের মাঝে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। কেউ শুধু রাতে দেখতে পায়, দিনে দেখে না। কেউ দিনের বেলায় দেখে ঠিকই; কিন্তু খুব কষ্ট হয়। অনেকে বড় অক্ষর দেখে কিন্তু ছোট অক্ষর চশমা ছাড়া দেখতে পায় না। কেউ এমনও আছে, যার কোনো কিছু দেখতে হলে চোখের খুব কাছে এনে দেখতে হয়। আবার কেউ সম্পূর্ণ এর বিপরীত। স্বাভাবিক দূরত্বের চেয়ে বেশি দূরে রেখে দেখে। ঈমানদার ও একত্ববাদীদের অন্তরে ঈমানের নূরের মাঝে যে তফাত বা বৈচিত্র্য রয়েছে একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া তার সঠিক অনুমান কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। কারো অন্তরে এই নূর সূর্যের ন্যায় ঝলমলে। কারো কলবে তা চাঁদের কিরণের মতো স্নিগ্ধ। কারো অবস্থা তারকারাজির মতো উজ্জ্বল। আর কারো ঈমানের নূর মিটি মিটি চেরাগের মতো। ঈমানের নূর যত শক্তিশালী ও তীব্র হয় নফসের খাহেশাতকে তত বেশি দমিয়ে রাখে। একসময় এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, যখন সকল কামরিপু নিঃশেষ করে ছোট-বড় সকল গোনাহকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। বরং এমন তেজোদীপ্ত ঈমানের নূরের সামনে জাহান্নামের আগুনও চিৎকার করে বলতে থাকে হে ঈমানদার! দ্রুত অতিক্রম করে চলে যাও। তোমার ঈমানের নূর আমার অগ্নিশিখাকে নিভিয়ে দিচ্ছে। (শরহু ফিকহিল আকবর ১২৮-১২৯)

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত তাকমীলে ঈমান তথা ঈমানকে পূর্ণাঙ্গরূপ দানের সিলেবাসের মাঝে প্রাথমিক স্তর মাত্র। (মালফূজাত ২৯)

এ মেহনতের ফলে ঈমানের মাঝে চৈতন্য ফিরে আসে, সাধারণ ঈমানদারের ঈমানী নূর বৃদ্ধি পায়। আবার ঈমানের এমন উঁচু স্তরও আছে মানুষের সাথে মেলামেশা দ্বারা সফর, গাশত, বয়ান ইত্যাদি আমলে ব্যস্ত হয়ে পড়ার দ্বারা যার নূরের মাঝে ছায়া পড়ে যায়।

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর জীবনী যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর ঈমানের নূর এত উঁচু স্তরের ছিল যে তাবলীগি সফর বা কোনো ইজতিমায় শরীক হওয়ার ফলে সেই নূরের মাঝে আবরণ উপলব্ধি হতো। তাই ফিরে এসে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সাহারণপুর বা রায়পুরের খানকাতে কিছুদিন নির্জন বাস করতেন। (আপবীতি)

ফলে সেই নূর পূর্বের অবস্থায় উন্নীত হতো।

সহজ উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি এভাবে বোঝা যেতে পারে, কূপ থেকে পানি সিঞ্চন করলে সকলে উপকৃত হয় কিন্তু কূপের পানি হ্রাস পায়। কিছুক্ষণ বিরতি দিলে আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। ঠিক তদ্রূপ তাকমীলে ঈমানের মেহনত করতে করতে যাঁরা দিলের ভেতর ঈমানের কূপ খনন করে ফেলেছেন তাঁদের স্তর আর সাধারণ মুমিনের ঈমানী নূর এক স্তরের নয়।

তাবলীগের মোবারক মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সৌভাগ্য যারা লাভ করতে পেরেছি তাদের ঈমানের স্তর উন্নীত করার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা মুরব্বি চতুষ্টয়ের সকল হেদায়াতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ আর অনুকরণ। তাঁরা যেভাবে নিজেদের ব্যক্তিকে সাহাবাওয়ালা জীবনের নমুনায় ঢেলে সাজিয়েছিলেন আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে নিজেদের জীবন গড়তে পারি। হতে পারি একজন প্রকৃত দায়ী।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজীর হেদায়াত-২

মুফতী শরীফুল আজম

দাওয়াতের মেহনত মূলত ঈমানী শক্তিকে জাগিয়ে তোলার মেহনত। ঈমানকে উঁচু থেকে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়ার পথ মসৃণ করার মেহনত। বলাবাহুল্য, এ পথ যে এতটা কণ্টকাকীর্ণ ও পিচ্ছিল, পদে পদে সদা হোঁচট খাওয়া আর পা পিছলে যাওয়ার ভয়। তাই এখানে বড়দের পদাঙ্ক অনুসরণ অতীব জরুরি। হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.)-এর কথা থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা গেল। মুবাল্লিগ ভাইদের জন্য যা মূল্যবান পাথেয় হিসেবে গণ্য। ঈমান এবং ঈমানের স্তর নিয়ে আজকের আলোচনা।

ঈমান বিলগাইব

ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অদৃশ্যের সাথে, পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুধাবন করা যায় না। শুধুমাত্র নবী-রাসূলদের (আ.) প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে মেনে নিতে হয়। আর পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে অনুধাবনের পর মানার নাম হচ্ছে তাসদীক তথা সত্যায়ন। মোট কথা, না দেখা জিনিস মানার নামই ঈমান, আর দেখা জিনিস মানার নাম তাসদীক।

ঈমানের ভিত

ঈমানের ভিত্তি দলিলের ওপর রাখা হয়নি বরং ই'তিমাদ তথা আস্থার ওপর রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের ভিত্তি দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দলিল দিয়ে কোনো বিষয় প্রমাণ করা হলে এর বিপরীতও অনেক দলিল থেকে যায়। আজকে এক দলিল দিয়ে যা প্রমাণ করা হলো কাল সেটা ভিন্ন দলিলের মাধ্যমে ভুল প্রমাণিত হয়। কারো কাছে একটি দলিল পরিষ্কার বুঝে আসে আবার অপরজনের কাছে এর বিপরীত দলিল স্পষ্ট বলে মনে হয়। তাই ঈমানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে দলিলের মারপ্যাঁচের ঊর্ধ্বে নিয়ে এর চেয়ে শক্তিশালী ও আস্থাশীল ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হয়েছে। আর তা হচ্ছে বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথায় আস্থা রেখে তার সব কথা মেনে নেওয়া।

দলিল দিয়ে কোনো কিছু প্রমাণের চেষ্টা হলেও তা একপর্যায়ে কারো থিওরিতে আস্থা রাখা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। অন্যথায় দলিলের মাধ্যমে সকল অনুষঙ্গ প্রমাণ করতে হলে তা এত দীর্ঘ হবে যে গোটা জীবন একটি বিষয় প্রমাণ করতেই কেটে যাবে।

ইনসাফের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তবে বলতে হবে যে একজন অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের উক্তি স্বয়ং এমন শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়, যা হাজারো দলিলের ঊর্ধ্বে। আজও আমরা নিজেদের গবেষণা আর অনুসন্ধানের ইতি টানি কোনো পশ্চিমা দার্শনিকের থিওরি দিয়ে। তাদের নামের রেফারেন্সকে এত শক্তিশালী দলিল ভাবা হয় যার পর আর কোনো দলিলের প্রয়োজন থাকে না। এর কারণ এটা নয় যে ওই দার্শনিকের কথা বিনা দলিলে মানার উপযোগী। বরং এর পেছনে এ কথার বিশ্বাস কাজ করে যে এ সকল দর্শন ওই দার্শনিকের কাছে যেহেতু উপযুক্ত দলিলভিত্তিক প্রমাণিত তাই নতুন করে এর দলিল অনুসন্ধান অনর্থক।

ঈমানের বিষয়টিও ঠিক এমনই। নবী-রাসূলদের কথা বিনা দলিলে মানার অর্থ এটাই। তাদের আনীত বার্তাও এমন দলিলভিত্তিক প্রমাণিত, যাতে ভুলভ্রান্তি অসম্ভব। বরং তারা এমন আস্থাভাজন হয়ে থাকেন যে তাঁদের অস্তিত্বই একটি অকাট্য প্রমাণ হিসেবে ধর্তব্য হয়ে থাকে। (তরজুমানুস সুন্নাহ)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌঁছে গেছে, আর আমি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছি। (নিসা-১৭৪)

এ আয়াতে 'বুরহান' শব্দ দ্বারা রাসূল (সা.)-এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে। (তফসীরে রুহুল মা'আনী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য 'বুরহান' শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে তাঁর বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব মোজেযাসমূহ, তাঁর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রিসালতের অকাট্য দলিল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পর আর কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যকতা বাকি থাকে না। অতএব তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। (তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন)

ঈমানের স্বাদ

অতএব নবী-রাসূলদের আনীত খবর তাঁদের প্রতি আস্থা রেখে মেনে নেওয়া অন্ধ ভক্তি নয় বরং আপাদমস্তক সুস্পষ্ট এক দলিলের অনুসরণ। ঈমানের মহামূল্যবান হওয়ার রহস্য এটাই। বিনা

দলিলে নবী-রাসূলদের প্রতি অগাধ আস্থা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তিতর্ক পরিহার করে মনেপ্রাণে তাঁদের কথা মেনে নেওয়া। নিজের সকল ইচ্ছাকে রবের হুকুমের সামনে কুরবান করে দেওয়া। এটা মামুলি বিষয় নয়। এটাই হচ্ছে প্রকৃত ঈমান। এর নকশা যখন মানুষের অন্তরে বসে যায় তখন একমুহূর্তে পূর্বপুরুষদের সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস অন্তর থেকে মুছে দেয়। গর্ব আর অহংকারের বস্তুগুলো মুসিবত মনে হতে থাকে। এমনকি খানাপিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, কথাবার্তা–সকল ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক তথা পঞ্চইন্দ্রিয়ের অনুভূতির দুনিয়া ওলটপালট হয়ে যায়। যে সুর আগে মনমাতানো ছিল, যে দৃশ্য আগে চিত্তাকর্ষক ছিল, যে খাবার আগে মজাদার মনে হতো, যে সুগন্ধি একসময় মন জুড়াত, এখন আর ওই সুরে মূর্ছা যায় না, ওই দৃশ্য মন কাড়ে না, ওই খাবার খেতে ইচ্ছে করে না, ওই ঘ্রাণ আর ভালো লাগে না। পুরনো অভ্যাসের কথা কখনো উঁকিঝুঁকি দিলেও মন তাকে ভেতরে ভেতরে বোঝাতে থাকে, ওসবের দিকে আর যাওয়া যাবে না। তুমি এখন ঈমানদার। ঈমানের মজবুত বন্ধন তাকে ইসলামের সীমারেখা লঙ্ঘন করতে দেয় না। নফস চায় পুরাতন মজাগুলো পুনরায় আস্বাদন করাতে, কিন্তু ঈমানের স্বাদ ওই সব মজাকে পানসে করে দেয়।

হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ :أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

তিন জিনিস যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত অন্য সব কিছুর ওপর প্রবল হওয়া। কাউকে মহব্বত করলে একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দনীয় হওয়া। (বুখারী, হা. ১৬)

ঈমানের চার স্তর

(১) বাহ্যিক ঈমান। (২) প্রকৃত ঈমান। (৩) পূর্ণাঙ্গ ঈমান। (৪) উঁচু স্তরের ঈমান।

এক. বাহ্যিক ঈমান :

নবীজি মুহাম্মদ (সা.)-এর আনীত দ্বীন যেহেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানব-দানবের জন্য বলবৎ থাকবে, তাই এ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁর উম্মতের মাঝে ঈমানী শক্তির তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। প্রাথমিকভাবে একজন মানুষকে মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করার কিছু ঈমানী গুণাবলি বা নিদর্শন ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। এই আলামতগুলো পাওয়া গেলে তার সাথে পার্থিব বিষয়ে মুসলমানদের মতো আচরণ করা হবে। সে জানমালের নিরাপত্তা পাবে। মারা গেলে মুসলমানদের গোরস্তানে দাফন হবে।

ঈমানের এই স্তরের মাপকাঠি হিসেবে এমন সব বাহ্যিক বিষয়কে নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। মুসলিম-অমুসলিমের পার্থক্য বুঝে আসে। বাহ্যিক এই ঈমানের কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য প্রদান এবং নামায ও যাকাতের পাবন্দি না করা পর্যন্ত মানুষদের সাথে যুদ্ধ চলিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা যখন এ সকল কাজ করবে তখন আমার হাত থেকে নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা পাবে। তবে ইসলামের অন্য কোনো হক্ব নষ্ট করলে তা ভিন্ন কথা। আর তাদের মনে কোনো কুটিলতা থাকলে এর হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তা'আলার সাথে হবে। (বুখারী হা. ২৫, মুসলিম হা. ৩৬)

এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

যে ব্যক্তি আমাদের মতো নামায আদায় করল, আমাদের কিবলার দিকে মুখ ফেরাল এবং আমাদের জবাইকৃত পশু আহার করল তবে সে এমন মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে, যার জিম্মাদারী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর বর্তায়। অতএব তোমরা আল্লাহর জিম্মাদারীর মাঝে হস্তক্ষেপ করো না। (বুখারী হা. ৩৯১)

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে,

عن أنس بن مالك، قال :قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم " :-ثلاث من أصلِ الإيمان :الكفُّ عمَّن قال :لا إله إلا اللهُ، ولا نكفِّره بذنبٍ، ولا نُخرجُه من الإسلام بعملٍ الخ

"ঈমানের মূল বিষয় তিনটি। এক. যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে তাকে

ছেড়ে দেওয়া। কোনো গোনাহের কারণে আমরা তাকে কাফের বলব না এবং কোনো বদ আমলের কারণে তাকে ইসলাম থেকে খারিজ করব না।......” (আবু দাউদ হা. ২৫৩২)

এ সকল হাদীসের অর্থ এই নয় যে মুসলমান হওয়ার জন্য শুধু নামায, রোজা আর গরুর গোশত খাওয়াই যথেষ্ট। এরপর আর যা ইচ্ছা করো, যেকোনো আকীদা বিশ্বাস ধারণ করো তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং মুসলমান হিসেবে পার্থিব হুকুম-আহকাম কার্যকর করার জন্য এমন কিছু বাহ্যিক আলামত নির্ধারণ এখানে উদ্দেশ্য যার দ্বারা মুসলিম-অমুসলিম পার্থক্য করতে কোনো রূপ বেগ পেতে না হয়। এ সকল লক্ষণ দেখে বুঝতে হবে লোকটি মুসলমান। এখন যদি কেহ ধোঁকার আশ্রয় নেয় তবে তার জবাবদিহিতা আখেরাতে হবে আর পার্থিব বিধিবিধান বাহ্যিক অবস্থার বিবেচনায় জারি করা হবে। এটাই হচ্ছে ঈমানের ন্যূনতম স্তর তথা বাহ্যিক ঈমান। সাধারণত এই স্তরের ঈমানকে ইসলাম আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

মরুবাসীরা বলে : আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করোনি; বরং বলো আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনো তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। (হুজরাত-১৪)

দুই. প্রকৃত ঈমান

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে প্রকৃত ঈমান। যার ভিত্তিতে পরকালে চীরস্থায়ী মুক্তি লাভ হবে, দেরিতে হলেও হবে, আর এটাই হচ্ছে ঈমানের আসল স্তর। যেখানে কোনো কমবেশি হয় না। যার মূল বক্তব্য হচ্ছে ঈমানের জরুরি বিষয়সমূহকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে বিনা দলিলে মেনে নেওয়া এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম মতো জীবনযাপনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। প্রসিদ্ধ হাদীসে জিবরাঈলে এই স্তরের কথা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে,

مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكِتَابِهِ، وَلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ

ঈমান হচ্ছে, আপনি অন্তর থেকে আল্লাহ তা’আলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকালকে মেনে নেবেন। আর তাকদীরের ভালোমন্দ মেনে নেবেন। (মুসলিম হা. ৭)

বিনা দলিলে পূর্ণ আনুগত্য

প্রকৃত ঈমান যখন মানুষের অন্তরে বসে যায় তখন সে বিনা দলিলে সব কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায় আর নিজের সকল চাহিদা ও ইচ্ছাকে কোরবান করে দিতে রাজি হয়ে যায়। যাকে تفويض এবং تسليم বলা হয়। ঈমানের এই পরীক্ষাতে এসেই ইবলিস ফেল করেছিল। বিনা দলিলে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ব্যর্থতাই তার অভিশপ্ত হওয়ার মূল কারণ। ইবলিস কখনো আল্লাহ তা’আলার ইবাদত করতে অস্বীকার করেনি। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা যখন তার ঈমানের পরীক্ষা নিলেন তখন নিজের ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা নেননি বরং একমুষ্টি মাটির সৃষ্টির সামনে মাথানত করার নির্দেশ দিলেন। মাথানত করা তো কোনো বড় বিষয় ছিল না; কিন্তু সামান্য মাটির আদম যে কিনা তার মতোই এক মাখলুক তার সামনে মাথা ঝুঁকানো অযৌক্তিক মনে হওয়ায় সে চুপ থাকতে পারেনি। প্রতিবাদ করে বলে উঠল,

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। (আ’রাফ-১২) দলিল আর যুক্তির পেছনে পড়লে যা হওয়ার, তা-ই হলো। তার ভেতর লুক্কায়িত অহমিকা আর বক্রতা প্রকাশ পেয়ে গেল। আনুগত্য ও সন্তুষ্টির ওই ঘাঁটিতে গিয়ে সে অকৃতকার্য হয়ে গেল, যেখানে ভালোমন্দের বিবেচনা করার সুযোগ থাকে না, কিন্তু কেন বলে কোনো আপত্তি করা চলে না। শুধু হাসিমুখে সব মেনে নিতে হয় বিনা দলিলে। (তরজুমানুস সুন্নাহ)

দ্বীনের ভিত্তি ঈমান

দ্বীন ইসলামের ভিত্তি মূলত এই ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের যত আকীদা বিশ্বাস রয়েছে তার মূলে রয়েছে এই ঈমান। ঈমান ছাড়া সব অন্ধকার। কোনো আমল সাধনা-আরাধনার যত স্তরই পার করুক না কেন, ঈমান ছাড়া তা একটি শুকনো খড়ের মতো। মিজানের পাল্লায় ওজনহীন। ইরশাদ হচ্ছে,

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (كهف ١٠٥)

সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোনো ওজন স্থির করব না। (কাহাফ ১০৫)

আকীদা-বিশ্বাস আর আমলের কথা বাদই দিলাম, সামান্য নিয়্যাত চাই, সেটা যত খাঁটিই হোক না কেন ঈমান ছাড়া আল্লাহর দরবারে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। ঈমানই হচ্ছে সকল আকীদা-বিশ্বাস আর ভালো নিয়্যাতের প্রাণ, যার বদৌলতে কুফরের সকল অন্ধকার এক পলকে মিশে যেতে পারে। জাহান্নামের আগুন নিভে যেতে পারে। জান্নাতে আদন বিনিময় সাব্যস্ত হতে পারে। সামান্য একটি সিজদা শত বছরের সাধনার জন্য ঈর্ষার কারণ হতে

পারে। একমুষ্টি পরিমাণ সদকা পাহাড় পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। মোটকথা, চিরস্থায়ী সৌভাগ্য প্রকৃত ঈমান দ্বারা লাভ হয়। আর ঈমান থেকে বঞ্চিত হলে দুর্ভাগা হতে হয়।

তিন. পূর্ণাঙ্গ ঈমান

ঈমানের তৃতীয় প্রকার হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ঈমান। প্রকৃত ঈমান যখন ইসলামের হুকুম-আহকাম দ্বারা সজ্জিত হতে থাকে তখন এর মাঝে মজবুতী আসে, পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। এই ঈমানের ফলে বিনা সাজায় প্রথমবারেই জান্নাত লাভ হবে। ঈমানের এই স্তরের মাঝে সদা কমবেশ হতে থাকে। পবিত্র কোরআনে ঈমান বৃদ্ধির যে কথা বলা হয়েছে তা এই স্তরের সাথে সম্পৃক্ত। আর ইমাম আজম (রহ.) যে বলেছেন, ঈমানে কমবেশ হয় না সেটা হচ্ছে প্রকৃত ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত, পূর্ণাঙ্গ ঈমানের সাথে নয়।

নবীজি (সা.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ঈমানের এই স্তরের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়কে ঈমান আখ্যা দিতেন। যেমন তিনি বলেন,

حُبُّ الْأَنْصَارِ إِيمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ نِفَاقٌ

আনসারদের মহব্বত ঈমানের অংশ। নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

যার মাঝে আমানতদারী নেই তার ঈমানই নেই। (সহীহে ইবনে হিব্বান ১৯৪)

তিনি আরো বলেন,

وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

মুমিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে মানুষের জানমাল নিরাপদ থাকে। (তিরমিযী হা. ২৬২৭) অর্থাৎ আমানতদারী এবং মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ঈমানের অঙ্গ। এগুলো ছাড়া ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না। ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকামকে ঈমান অবহিত করার মাঝে নবীজি (সা.)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথার ওপর জোর দেওয়া যে এ সকল আমল পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ। এগুলো না হলে ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না।

মোটকথা, ঈমানের এমন অসংখ্য শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমানের সত্তর অধিক শাখা রয়েছে। ইসলামের মাঝে ভালো যত আমল রয়েছে তার সবই পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ, এর শাখা।

ঈমানের দৃষ্টান্ত

প্রকৃত ঈমান যখন অন্তরে বসে যায় তখন নেক আমলের পানি সিঞ্চন তার মাঝে ডালপালা আর ফুল-ফল ধরতে সহায়তা করে। পূর্ণাঙ্গ ঈমানের উদাহরণ পূর্ণাঙ্গ একটি বৃক্ষের মতো। যাতে রয়েছে ডালপালা, পাতা-পল্লব, ফুল, আর থোকায় থোকায় ফল। এর ফল খেয়ে মানুষ পরিতৃপ্ত হয়, এর ছায়ায় বসে পথিক শরীর জুড়ায়। সব দিক দিয়েই তা মূল্যবান ও উপকারী প্রমাণিত হয়। এখন যদি এই গাছের ডালগুলো কেটে ফেলা হয়, পাতা ছিঁড়ে ফেলা হয় ও ফল পেরে ফেলা হয় তখন সেটা বৃক্ষই থাকে তবে অপূর্ণাঙ্গ। আমল-আখলাকের দৃষ্টান্তও ঠিক তেমন। নেক আমল না হলেও মুমিন থাকবে তবে অপূর্ণাঙ্গ। আর যদি বৃক্ষের মূলোৎপাটন করা হয় তখন তার অস্তিত্বই শেষ হয়ে যায়। ঠিক তেমনি যদি তাসদীক তথা আনুগত্যের মতো প্রকৃত ঈমানই না থাকে তবে সে মুমিন হতে পারে না।

ঈমানের নূর

ঈমান যখন ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে যায় তখন সেটা নূরের আকৃতি ধারণ করতে থাকে। হযরত আলী (রা.) বলেন, ঈমান সর্বপ্রথম একটি শুভ্র বিন্দুর মতো কলবের ওপর উদ্ভাসিত হয় এরপর ঈমান যত বাড়ে বিন্দুটি তত বিস্তৃত হতে থাকে। একপর্যায়ে ঈমান যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন গোটা কলব সফেদ হয়ে যায়। মুনাফিকির পরিণতিও তাই হয়ে থাকে। প্রথমে একটি কালো বিন্দুর মতো অন্তরে দাগ পড়ে, পরিশেষে গোটা কলব কালো হয়ে যায়। আল্লাহর কসম, তোমরা যদি কোনো মুমিনের কলব বের করে দেখো তবে তা একেবারে সাদা দেখাবে। আর যদি কোনো মুনাফেকের কলব বের করে দেখো তবে তা একেবারে কালো দেখতে পাবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন নবীজি (সা.)-এর বক্ষঃ মুবারক বিদীর্ণ করার ঘটনা ঘটেছিল, তখন একটি স্বর্ণের তশতরি ভরে ঈমান ও হেকমত এনে তাঁর সীনা মুবারকে ভরে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ ঈমানের নূরই হয়তো তাঁর সীনায় দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটা অসম্ভব কিছু নয়। নবী-রাসূলদের ঈমানী কামালাত, ঈমানী শক্তি সাধনা করে অর্জন করতে হয় না। বরং আল্লাহর কুদরতে তাঁদের কামালাত ও পূর্ণতা অর্জিত হয়ে যায়।

ঈমানের এই নূর যত বেশি জ্যোতির্ময় হয় নফস আর প্রবৃত্তির খাহেশাত ততই হ্রাস পেতে থাকে। আর প্রবৃত্তি যত দুর্বল হয় ঈমানের নূর তত বেশি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। হতে হতে ওই নূর এত বিস্তৃতি লাভ করে যে মানুষের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ঘিরে নেয়। আর ওই মুমিনের ব্যক্তিসত্তা তখন আপাদমস্তক নূরের মিনার হয়ে যায়। যাকে দেখলে নিজের অজান্তেই আল্লাহর স্বরণ জাগ্রত হয়ে ওঠে। নবীজি (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার সর্বোত্তম বান্দা ওই সকল লোক যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্বরণ

জাগে। (মেশকাত)

একীনওয়ালা ঈমান

এ পর্যায়ে এসে ঈমানের মাঝে একীন পয়দা হয়। বিশ্বাস স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয়। আর একীনের গভীরতা ও বিস্তৃতির আনুপাতিক হারে আল্লাহর হুকুম-আহকাম মানা এবং নিষিদ্ধ কাজ ছাড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। একই সাথে অন্তরের রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে উত্তম গুণাগুণে ভরপুর হয়ে ওঠে। তখন কলব এত প্রশস্ত হয়ে যায় যে গোটা বিশ্ব তার কাছে একটি বিন্দুর মতো মনে হতে থাকে। মুমিনের এমন কলবেই আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লি হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّه

আল্লাহ যার বক্ষঃ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নূরের মাঝে রয়েছে। (সূরা জুমার ২২)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সামনে আয়াতটি তেলাওয়াত করলে আমরা شــــرح صـــدر তথা বক্ষঃ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহর বিধিবিধান হৃদয়াঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর লক্ষণ কী? তিনি বললেন,

اَلْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّجَافِى عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالْاِسْتِعْدَادِ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِه

এর লক্ষণ হচ্ছে–

(১) আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হওয়া

(২) ধোঁকার বাসস্থান দুনিয়াবিমুখ হওয়া

(৩) মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (মেশকাত, রুহুল মা'আনী)

এই লক্ষণগুলো পাওয়া গেলে বুঝতে হবে ঈমানের মাঝে একীন পয়দা হয়েছে।

দাওয়াতের মাকসাদ

সকল নবী-রাসূলের ঈমানী দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল ঈমানের এই স্তর অর্জন করা। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ একীনওয়ালা ঈমানের দাওয়াতই ছিল তাঁদের মিশন। এই স্তরের ঈমানের ওপরই নির্ভর করে বিনা সাজায় প্রথমবারেই জান্নাতে প্রবেশ। এটাই প্রকৃত ও স্থায়ী সফলতার চাবিকাঠি। এমন ঈমানের অধিকারী মুমিনের কানে সদা প্রতিধ্বনিত হয়

رضى الله عنهم ورضوا عنه

আল্লাহ তাদের ওপর সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর ওপর রাজি। এমন মুমিনকে যদি আগুনে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয় আর কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তবুও তার প্রতিটি কণা থেকে ঈমানের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। এমন ঈমানের নূর শুধু কলবেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং বাহ্যিক অঙ্গে তা ফুটে ওঠে। ইরশাদ হচ্ছে,

سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُود

তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। (সূরা আল ফাতহ-২৯)

এখানে সিজদার চিহ্ন বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক ইবাদতকারীর মুখমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করা হয়।

ঈমানী বন্ধন

এমন ঈমান মানুষের স্বভাবজাত চাহিদায় পরিণত হয়ে যায়। ফলে স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের মতো অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে। সহজে তার থেকে দূর হয় না। বাদশাহ হিরাকল, যিনি আসমানী কিতাবের অনেক বড় আলেম ছিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)-এর সাথে তাঁর ঐতিহাসিক যে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়েছিল সেখানে ঈমানের এই স্তরের দিকে ইশারা করেই তিনি আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর প্রতি ঈমান আনার পর কেহ মুরতাদ হয়ে ধর্ম ত্যাগ করে কি? আবু সুফিয়ান হাজারো দুশমনি সত্ত্বেও সেদিন সত্য প্রকাশে বাধ্য হয়ে না-সূচক জবাব দিয়েছিল। জবাব শুনে হিরাক্ল যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অনুমিত হয়। তিনি বললেন,

وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ(بخارى)

এটাই ঈমানের বৈশিষ্ট্য, যখন তা কলবে মিশে যায় আর কখনো বের হয় না।

চার . উঁচু স্তরের ঈমান

পূর্ণাঙ্গ ঈমানের নূর যখন অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়ে গভীর থেকে গভীরে পৌঁছে যায় তখন হৃদয়ের মাঝে একটি হাল সৃষ্টি হয়। অন্তরে এক ধরনের প্রশান্তি বিরাজ করে। যা আল্লাহ তা'আলার একান্ত খাছ বান্দাগণ লাভ করে থাকে। ঈমানের এই স্তরকে হাদীসের ভাষায় ইহসান বল হয়। আর মুজতাহিদগণের ভাষায় মা'আরেফত বলা হয়। প্রসিদ্ধ হাদীসে জিবরাঈলের সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে 'ইহসান' কী? এর উত্তরে নবীজি (সা.) বলেছিলেন,

قَالَ :مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ :أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়া, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। যদি তা সম্ভব না হয় তবে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। (বুখারী শরীফ হা. ৫০)

এটা ঈমানের অতি উঁচু স্তর। আর এই স্তরের মুমিনদের মাঝে আবার রয়েছে অসংখ্য অগণিত মর্তবা ও দরজা। ঈমানের এই স্তরের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে

বেশ কিছু হাদীসে। নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাঙ্গ। (মুসলিম) অর্থাৎ পবিত্রতা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে ব্যক্তি পবিত্রতার সাথে থাকার অভ্যাস করে তার দিলের মাঝে এক প্রকার ঈমানী স্বাদ ও স্বস্তি বিরাজ করে থাকে। পবিত্র না থাকলে ওই অনুভূতি চলে যায়। এটা অতি উঁচুমাপের ঈমান। নবীজি (সা.) ইরশাদ করেন,

إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

যখন কোনো বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন তার ঈমান বের হয়ে তার মাথার ওপর ছায়ার মতো বিরাজ করতে থাকে। এরপর যখন সে উক্ত গোনাহ থেকে সরে আসে তখন ঈমান তার কাছে ফিরে আসে। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

অর্থাৎ গোনাহে লিপ্ত থাকাবস্থায় এই স্তরের ঈমান বাকি থাকে না। দিলের ওই অবস্থা দূর হয়ে যায়।

হযরত মুআয (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীসে রয়েছে,

وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ :اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً

এসো, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান আনি, অর্থাৎ কিছুক্ষণ বসে ঈমানী আলোচনা করি। যাতে ঈমান তাজা হয় এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়, এটা ঈমানের উঁচু স্তরের অন্তর্ভুক্ত। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)

ঈমানের বিপরীত বস্তুসমূহ

কোনো জিনিসের পরিচয় লাভ করাটা অনেক সময় বিপরীত বস্তু দ্বারা সহজ হয়ে থাকে। তাই ঈমানের বিপরীত বস্তুগুলোও জানা দরকার। পূর্বে ঈমানের চার প্রকার বা স্তরের আলোচনা হয়েছে। যার সারকথা হলো, প্রথম প্রকারের ঈমান হচ্ছে দুনিয়ার বিধিবিধান জারির সহায়ক। বাহ্যিক এই ঈমানের কারণে পার্থিব জগতে মুসলমানের মতো সুবিধা ভোগ করতে থাকবে তবে আখেরাতে কিছুই পাবে না। বাকি তিন প্রকারের ঈমান আখেরাতের নাজাতের কারণ হবে। তন্মধ্যে প্রকৃত ঈমানের কারণে দুখুলে আবদী তথা চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ হবে। গোনাহখাতা মাফীর জন্য যদিও সাময়িক সাজা ভোগ করতে হয় তা ভিন্ন কথা। এর ওপরে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ ঈমান। যার দরুন দুখুলে আওয়ালি তথা বিনা সাজায় প্রথম ধাপেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপর রয়েছে উঁচু স্তরের ঈমান। যার ফলে বিনা হিসাবে জান্নাতে উঁচু স্তর লাভ হবে। এরপর এই স্তরের অধিবাসীদের মধ্যে থাকবে হাজারো দরজা।

এর বিপরীত প্রথম স্তর বাহ্যিক ঈমান তথা ظاهرى انقياد এর বিপরীত হচ্ছে কুফুর। দ্বিতীয় স্তরের ঈমান তথা প্রকৃত ঈমানের বিপরীত হচ্ছে اعتقادى نفاق আকীদাগত মুনাফেকি। যাতে

تصديق قلبى

অন্তরের সত্যায়ন এক বিন্দু পরিমাণও থাকে না। শুধু জানের ভয়ে বাহ্যিকভাবে মুমিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়ে থাকে। পরকালের বিচারে এমন মুনাফিক আর কাফেরের মাঝে কোনো তারতম্য হবে না। বরং এমন মুনাফিকের সাজা কাফেরের চেয়ে ভয়াবহ হবে। তাকে জাহান্নামের সবচেয়ে নিচু স্তরে রাখা হবে। যার বিবরণ সূরা নিসায় উল্লেখ রয়েছে।

তৃতীয় স্তরের ঈমান তথা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের বিপরীত হচ্ছে

(فسق)

পাপাচার। অন্তরে প্রকৃত তাসদীক লাভের পরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলে কমতি। যেমন ফরয ছেড়ে দেওয়া বা কবীরা গোনায় লিপ্ত হওয়া। এর ফলে ওই ব্যক্তি ফাসেক হিসেবে গণ্য হবে।

চতুর্থ স্তরের ঈমানের বিপরীত বস্তু হচ্ছে (نفاق عملى)

আমলী মুনাফেকী। অর্থাৎ অন্তরে প্রকৃত ঈমান থাকা সত্ত্বেও ইয়াকীনের দৌলত থেকে অন্তর খালি হওয়া। দিলের মাঝে বিশেষ হালত, ঈমানী মজা অনুভব না হওয়া।

নবী আর উম্মতের ঈমানী স্তর

ঈমানী স্তরের উদাহরণ দেখতে হলে হিজরতের ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। হিজরতের রাতে নবীজি (সা.) প্রিয় সহচর হযরত আবু বকর (রা.)সহ আশ্রয় নিয়েছিলেন সওর পর্বতের শীর্ষে অবস্থিত ঐতিহাসিক গারে সওরে। অগ্নিশর্মা কুরাইশগণ তাঁকে ধরার জন্য উন্মত্ত কুকুরের ন্যায় চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দিল। তাদের একটি দল অনুসন্ধান করতে করতে ওই গর্তের নিকট এসে পৌঁছাল। গুহার মুখের নিকট শত্রুদেরকে দেখতে পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম, আর রক্ষা নেই। হিংস্র কুরাইশদের মনোভাব দেখে তাই মনে হচ্ছিল। নিজের জন্য তাঁর এই ভয় ছিল না বরং প্রিয় নবীজি (সা.)-এর জন্য তিনি এই বলে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে হয়তো তারা প্রিয় নবীজির (সা.) জীবন নাশ করে দেবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ শত্রুরা আমাদের এত নিকটে চলে এসেছে যে যদি তারা নিজেদের পায়ের দিকে তাকায় তবে আমাদের দেখে ফেলবে। এমন কঠিন মুহূর্তে নবীজি (সা.)-এর অবস্থা কেমন ছিল সেটাই গোটা উম্মতের জন্য শিক্ষণীয়। এ

সময়ও তিনি ছিলেন পাহাড়ের মতো অনড়, অবিচল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয় বরং সফরসঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলেছিলেন,

لا تحزن ان الله معنا

"চিন্তিত হয়োও না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" পাঠক, একটু চিন্তা করে দেখুন, নিভৃত গুহায় মাত্র দুটি মানুষ। আর শত্রুরা মাথার ওপর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দণ্ডায়মান। পালানোর কোনো পথ নেই। মুক্তির উপায় নেই। অবধারিত মৃত্যুর মুখে নিপতিত। কিন্তু সেখানে মহামানবের মহান হৃদয় কেমন অবিচলিত সমুদ্রের ন্যায় কত গভীর প্রশান্ত, আকাশের ন্যায় কত নির্বিকার উন্মুক্ত। আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আপন হৃদয়ে নিজ মাওলার ওপর আস্থা এমনভাবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর পবিত্র হৃদয়ে ঈমানের তেজ এমনভাবে দৃপ্ত হয়ে উঠেছিল যে দুনিয়ার কোনো বিভীষিকা তাঁর সেই মহান হৃদয়কে এক মুহূর্তের জন্য বিচলিত করতে পারেনি। এটাই হচ্ছে নবী আর উম্মতের ঈমানী স্তরের মাঝে তফাত।

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা সকলের জানা। ফেরাউনের বাহিনী যখন তাঁদেরকে ধরতে গেল, সামনে সমুদ্র আর পেছনে শত্রু দেখে উম্মতেরা বিচলিত হয়ে বলে উঠল,

انا لمدركون

আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.) সেদিন আল্লাহ তা'আলার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে প্রশান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন–

كلاان معى ربى سيهدين

কখনো নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। (শুআরা ৬২)

সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী স্তর

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে চার খলিফার স্থান সবার ঊর্ধ্বে। চার খলিফার পরস্পর মর্যাদা তাঁদের খেলাফতের তারতীব অনুসারে প্রতিষ্ঠিত। এর মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঈমানী স্তর সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। নবীজি (সা.)-এর মহাপ্রস্থানের দিন যা সকলের সামনে ফুঁটে ওঠে। নবীজি (সা.)-এর বিচ্ছেদের সংবাদ শুনে সেরা সেরা সাহাবী শোকের প্রচণ্ড আঘাতে জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন। কারো বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেল। কেহ জড় পদার্থের ন্যায় অচল হয়ে পড়ে রইলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর জবান বন্ধ হয়ে গেল। হযরত আলী (রা.) অসাড়ের মতো বসে রইলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস (রা.) শোকের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করলেন। হযরত উমর (রা.) জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। তিনি উলঙ্গ তরবারি হাতে নিয়ে উম্মাদের মতো পথে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, যে বলবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। তাঁকে নিবৃত করার মতো তখন কেহ ছিল না। এমন কঠিন মুহূর্তে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। সেদিন তাঁর ঈমানী প্রজ্ঞা গোটা উম্মতকে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে নিজেকে সামলে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি হযরত উমর (রা.)-কে শান্ত করতে এগিয়ে এলেন। বললেন, উমর তুমি বসো। কিন্তু তিনি বসলেন না। তখন হযরত আবু (রা.) লোকদের লক্ষ করে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তোমরা শুনে রাখো! এত দিন যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপাসক ছিল সে জেনে রাখুক যে মুহাম্মাদ (সা.) মারা গেছেন। আর যে আল্লাহর উপাসক ছিল সে জেনে রাখুক আল্লাহর মৃত্যু নেই। তিনি অবিনশ্বর। এরপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

মুহাম্মদ (সা.) একজন প্রেরিত নবী ছাড়া আর কিছুই নন। নিশ্চয়ই তাঁর পূর্ববর্তী অন্য নবীগণ (আ.) ইন্তেকাল করে চলে গেছেন। (আলে ইমরান ১৪৪)

এই আয়াত পাঠ করার পর সকলের চমক ভাঙল। হযরত উমর (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) যখন এই আয়াত পাঠ করলেন তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আমার পদযুগল ভারী বোধ হতে লাগল এবং হতবিহ্বল হয়ে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। সাহাবায়ে কেরাম যখন নবীজির (সা.)-এর মৃত্যু সংবাদ মেনে নিতে পারছিলেন না তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রেজা বিল কাযা তথা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকার যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, সত্যি তা ঈমানী শক্তির পরিচায়ক। ঈমানের এই কঠিন পরীক্ষায় সেদিন তিনি উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। তাঁর ঈমানদীপ্ত কয়েকটি সান্ত্বনাবাণীর মাঝে সেদিন কী যে শক্তি ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন। সামান্য কয়েকটি কথায় সকলের মনের আগুন প্রশমিত হয়ে গেল। বেহুঁশদের জ্ঞান ফিরে এল। যারা মৃত্যু শব্দটি শুনতে প্রস্তুত ছিলেন না তাঁরা কাফন-দাফনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সিদ্দীকে আকবরের (রা.) ঈমানী শক্তি সেদিন সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে নেয়। (বুখারী শরীফ ৩৬৬৮, সুনানে কুবরা ৬৭১০)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৩

মুফতী শরীফুল আজম

(সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর পর)

পীর-মাশায়েখের সোহবত :

যে পথ ধরে ঈমানকে নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। যে পন্থা অবলম্বন করে ঈমানের স্তরসমূহ হাসিল করে খাঁটি বান্দা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করা সম্ভব। ঈমানী তারাক্কীর এমন পথ ও পন্থা আসলে কোনটি? এ ব্যাপারে দাওয়াত ও তাবলীগের পথিকৃৎ হযরতজি শাহ মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মালফুজাত থেকে আমরা কিছু দিকনির্দেশনা পেতে পারি।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর ভাষ্য মতে, দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচলিত মেহনতের মূল উদ্দেশ্য যদিও ঈমান আমলে পূর্ণাঙ্গতা অর্জন; কিন্তু এর মাঝে যে সকল আমল চালু করা হয়েছে যেমন–তিন দিন, চিল্লা, তিন চিল্লা, গাশত, মোলাকাত ইত্যাদি এগুলোকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। আর সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে হক্কানী উলামা-মাশায়েখের দ্বারস্থ হয়ে তাদের সোহবতের মাধ্যমে চেষ্টা করে যাওয়ার হেদায়াত প্রদান করা হয়েছে। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেন,

ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا (یعنی اسلام کے پورے علمی و عملی نظام سے وابستہ کر دینا) یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد رہی قافلوں کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی گشت سو یہ اس مقصد کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے اور کلمہ و نماز کی تلقین و تعلیم گویا ہمارے پورے نصاب کی الف ، ب، ت ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے قافلے پورا کام نہیں کر سکتے ان سے تو بس اتنا ہی ہو سکتا ہے تو ہر جگہ پہنچ کر اپنی جد و جہد سے ایک حرکت و بیداری پیدا کر دیں اور غافلوں کو متوجہ کر کے وہاں کے مقامی اہل دین سے وابستہ کرنے کی اور اس جگہ کے دین کی فکر کرنے والوں (علماء وصلحاء) کو بیچارے عوام کی اصلاح پر لگا دینے کی کوشش کریں۔

আমাদের এই মেহনতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলমানদের নবীজি (সা.) আনীত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। এটা হলো আসল উদ্দেশ্য। আর কাফেলার এই চলাফেরা এবং তাবলীগি গাশত ইত্যাদি হচ্ছে ওই লক্ষ্যে পৌঁছার প্রাথমিক মাধ্যম মাত্র। অনুরূপ কালেমা এবং নামাযের তালকীন ও প্রশিক্ষণ যেন আমাদের পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসের মাঝে অ, আ, ই-এর মতো আদর্শলিপি পাঠতুল্য। এটাও স্পষ্ট যে আমাদের কাফেলা পুরা কাম আঞ্জাম দিতে পারবে না। তাদের পক্ষে শুধু এতটুকু সম্ভব হবে যে প্রত্যেক এলাকায় গিয়ে চেষ্টা-মেহনত করে একটি জাগরণ সৃষ্টি করে দেবে এবং গাফেলদের সজাগ করে এলাকার আহলে দ্বীনদের সাথে সম্পৃক্ত করে দেওয়া এবং দ্বীনের ফিকির করণেওয়ালা উলামা-মাশায়েখদের বেচারা সাধারণ মুসলমানদের ইসলাহে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করে যাবে। (মালফুজাত, পৃ-২৯)

হযরতজি (রহ.)-এর এ কথা থেকে এটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে যে এই মেহনতের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করে তাদের পূর্ণ দ্বীন আর ঈমান শিক্ষার জন্য উলামা-মাশায়েখের সাথে জুড়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য। এই মেহনত আদর্শলিপি পাঠের মতো। বিএ অথবা এমএ পাস করার জন্য প্রাথমিক স্তর হচ্ছে আদর্শলিপি পাঠ করা। কিন্তু আদর্শলিপির চর্চা নিয়েই যদি কেহ আজীবন পড়ে থাকে তবে তার পক্ষে এমএ পাস করা সম্ভব হবে না। হ্যাঁ, সে নিরক্ষরতার স্তর অবশ্য পার হতে পারে। অনুরূপ হযরতজি (রহ.) প্রণিত সিলেবাসের মাঝে মাশওয়ারা চিল্লা আর গাশত ইত্যাদি করে যে ক্ষান্ত হবে উলামা-মাশায়েখের সোহবতে যাবে না, তার ঈমান ও প্রাথমিক স্তর পার হবে ঠিক, তবে উঁচু স্তরে পৌঁছা তার জন্য দুষ্কর হবে।

উলামা-মাশায়েখের দৃষ্টি আকর্ষণ

উলামা-মাশায়েখের সোহবত ছাড়া শুধু তাবলীগ জামা'আতের কর্মসূচি পালন করে ঈমানের উঁচু স্তর অর্জন সম্ভব হবে না। বিষয়টি আরো পরিষ্কার বুঝে আসে হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর একটি আহবান থেকে। তিনি উলামা-মাশায়েখের উদ্দেশে বলেন,

علماء سے کہنا ہے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چلت پھرت اور محنت و کوشش سے عوام میں دین کی صرف طلب اور قدر ہی پیدا کی جا سکتی ہے اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جا سکتا ہے آگے دین کی تعلیم و تربیت کا کام علماء وصلحاء کی توجہ فرمائی ہی سے ہو سکتا ہے اس لیے آپ حضرت کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے۔

উলামায়ে কেরামদের বলতে চাই যে তাবলীগ জামা'আতের এই চলাফেরা আর চেষ্টা মোজাহাদার ফলে সর্বসাধারণের মাঝে দ্বীনের তলব এবং এর কদর শুধু সৃষ্টি করা সম্ভব। এর দ্বারা তাদেরকে দ্বীন শিখতে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এরপর দ্বীনের তা'লীম-তারবিয়াত এবং শিক্ষা-দীক্ষার কাজ উলামা-মাশায়েখের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল সম্ভব হতে পারে। তাই এদিকে আপনাদের দৃষ্টি দেওয়া অতীব

জরুরি। (মালফুজাত-১৪২)

অতএব দাওয়াতের এই মুবারক মেহনতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝে আসতে হবে। এর পরিধি ও কার্যকারিতা কতটুকু তা জেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। উলামা-মাশায়েখের কাছে সর্বসাধারণের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া শুধু তাবলীগ করে করে পরিপূর্ণ দ্বীন শেখা, ঈমান শেখা যে সম্ভব হবে না, এটা হযরতজির কথা থেকে স্পষ্ট। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর তাবলীগ আর উলামা-মাশায়েখের তা'লীম ও তারবিয়াতের সমন্বয়ে কেবল মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের হেফাজত ও তারাক্কী সম্ভব হবে, অন্যথায় নয়। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর সমকালীন উলামা-মাশায়েখগণ দাওয়াতের এই মেহনতকে এভাবেই জেনেছেন ও বুঝেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর তামান্নাও তাই ছিল। তিনি বলতেন মাওলানা ইলিয়াসের তাবলীগ আর উলামাদের তারবিয়াত—এই দুইয়ের সমন্বয়ে মানুষের দ্বীন পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

কর্মী বানানো উদ্দেশ্য নয়

দাওয়াতের মেহনতের ফলে একজন সাধারণ মুসলমানের মাঝে দ্বীনের যে পিপাসা তৈরি হয়, তা নিবারণের জন্য উলামা-মাশায়েখের সোহবত আবশ্যক। এ ছাড়া তার ঈমানকে পূর্ণতায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। প্রত্যেক মুবাল্লিগ ভাইয়ের একান্ত কর্তব্য হচ্ছে কোনো শায়খে কামেলের দ্বারস্থ হওয়া। তাঁর সোহবতে থেকে নিজের দ্বীন-ঈমানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। জিম্মাদারগণ তার মামুরদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এর মুহাসাবা ও কারগুজারী শুনতে হবে। তাবলীগের ছোট-বড় বিভিন্ন মাশওয়ারা বা জোড়ে যেভাবে কারগুজারী শোনা হয় যে কতজন আলেম কাজের সাথে জুড়ালেন বা কতজন শবগুজারীতে উপস্থিত হলেন ইত্যাদি। অনুরূপ কতজন তাবলীগের সাথি উলামা-মাশায়েখের সোহবতে গেলেন, কতজন শায়খে কামেলের দ্বারস্থ হলেন এবং সেখান থেকে দ্বীনের কোন কোন বিষয় হাসিল করলেন—এ বিষয়ে কারগুজারী শোনাও একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক হালকাতে কতজন সালওয়ালা এবং চিল্লাওয়ালা আলেম রয়েছেন এর হিসাব যেভাবে ছক কষে করা হয় তদ্রূপ কতজন মুবাল্লিগ ভাই শায়খে কামেলের সোহবত এখতিয়ার করলেন এবং মাসায়েলে ইলম শেখার জন্য হক্কানী আলেমের দ্বারস্থ হলেন এর হিসাবও রাখা চাই। যদি তা করা হয় তবে মুবাল্লিগ ভাইগণ এর প্রয়োজন অনুধাবনে সক্ষম হবেন। এর প্রতি উদ্বুদ্ধ হবেন ফলে তাঁদের ঈমানী তারাক্কীর পথ মসৃণ হবে। অন্যথায় তাঁদের মাঝে শুধু আলেমদের কাজে লাগানোর মেজাজ পয়দা হবে। তাঁদের সোহবত থেকে ফায়দা উঠানোর আবশ্যকতা বুঝে আসবে না। আর বাস্তব পরিস্থিতিও সে দিকেই মোড় নিচ্ছে বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ ব্যাপারে দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমাদের সবগুজারী পয়েন্ট হচ্ছে টঙ্গী ইজতেমা ময়দানের টিনশেড মসজিদ। একবার সবগুজারীতে গিয়ে মাওলানা ...... সাহেবের বয়ান শুনে থ খেয়ে গেলাম। দাওয়াতের এই মুবারক মেহনত যাঁদের কোরবানীর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়েছে সেই হযরতজির কথার সাথে উনার বয়ানের কোনো মিল নেই। বয়ানের সার কথা হলো, তাবলীগি সফরই হলো ইলম অর্জনের আসল পদ্ধতি। আলেম-উলামাদের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আর তাযকিয়ায়ে নফসের জন্য সুন্নাতের ওপর আমলই যথেষ্ট। সুন্নাত মতে পানাহার করলে, সুন্নাত মতে ঘুমালে তাযকিয়া হাসেল হয়ে যাবে। শায়খে কামেলের সোহবতের প্রয়োজন হবে না। আমবয়ানের পরে পশ্চিমের কামরায় উলামায়ে কেরামের খাস বয়ান ছিল। সেখানে গিয়ে ওই মাওলানা সাহেবের সাথে কথা বলার সুযোগ হলো। কাকরাইল মারকাযের তিনি স্বনামধন্য উস্তাদ এবং কাজের জিম্মাদার। (প্রকাশ থাকে যে পরবর্তীতে তাহকীক করে জানা যায় তিনি কাকরাইলের উস্তাদ নন, এমনকি দাওরা পাস আলেমও নন। দীর্ঘদিন মুফতী নাম ধারণ করে কাকরাইলে বসে মানুষদের বিভ্রান্ত করছেন।) একটি ফতওয়া প্রসঙ্গে তিনি কয়েকবার বসুন্ধরায় এসেছিলেন এবং বড় হুজুর (রহ.)-এর সাথে সে বিষয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছিল। মূলত সেই সুবাদেই তাঁর সাথে আমার পরিচয়। উলামায়ে কেরামের খাস মজলিসে তিনি বিভিন্ন আলেমদের সাথে মতবিনিময় করছিলেন। সুযোগ বুঝে আমি বয়ানের প্রসঙ্গ তুললাম। বললাম, তাযকিয়া শব্দের দাবি হচ্ছে এখানে একজন মুযাক্কি লাগবে। আপনি যে বললেন সুন্নাতের ওপর আমল করলেই তাযকিয়া হয়ে যাবে। তাহলে বিষয়টি কেমন হলো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, وكونوا مع الصادقين এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। এ আয়াতের দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে তাযকিয়ার জন্য শায়খে কামেলের সোহবত লাগবে। আমি নিজেও মাওলানা সা'দ সাহেবের হাতে বাইয়াত হয়েছি। আমি বললাম যে আপনি নিজে শায়েখের সোহবত অবলম্বন করলেন আর বয়ানে বললেন এর প্রয়োজন নেই। এভাবে তো সাধারণ মুবাল্লিগ ভাইয়েরা বিভ্রান্ত হবে। তিনি বললেন, শায়খের সোহবতে পাঠালে দাওয়াতের মেহনত ছেড়ে দেওয়ার ভয় থাকে। আমি বললাম যে শায়খের কাছে গেলে এমন ভয় থাকে না তার কাছে তো যেতে পারে। মূলত মিম্বর থেকে জিম্মাদার উলামাদের এমন মনগড়া বয়ান শুনে সাধারণ সাথিরা

বিভ্রান্ত হচ্ছে। শায়খে কামেলের সোহবতকে তারা দাওয়াতের কাজের অন্তরায় ভাবছে।

একবার আমাদের মহল্লা থেকে এক চিল্লার জামা'আত গেল নওগাঁ জেলার একটি ইউনিয়নে। জামা'আতের নুসরতে মহল্লার এক সাথিসহ আমরা দুজন সেখানে গেলাম। সাথিদের নিয়ে ছয় সিফাতের মুযাকারা শুরু হলো। আমি খুব উদ্বেগের সাথে লক্ষ করলাম যিকিরের সিফাতে গিয়ে হাসিল করার তরীকা বলার সময় হক্কানী পীর-মাশায়েখের অজিফা থাকলে তা আদায় করি–কথাটি বাদ দেওয়া হচ্ছে। অথচ যিকির হাসিল করার তরীকার মাঝে সকাল-বিকাল তিন তাসবিহ আদায়, জায়গায় জায়গায় মাসনূন দু'আসমূহ আদায় এবং হক্কানী পীর-মাশায়েখের অজিফা আদায় সমান গুরুত্বের সাথে বলা হতো। হঠাৎ এ পরিবর্তন দেখে আমি বিষয়টি বাদ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে জামা'আতের আমির সাহেব (যিনি বহু পুরাতন সাথি) বললেন, পীর-মাশায়েখের কাছে গেলে সাথি ছুটে যায়। আমি বললাম, যার কাছে গেলে মেহনতে ভাটা পড়ে না–এমন শায়খ বাছাই করা দরকার। সাধ্যমতে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। সাথিরা সবাই ছয় সিফাতের মুযাকারা বন্ধ করে কথাগুলো শুনলেন এবং সঠিক বিষয় জানতে পেরে খুশি হলেন।

সাথি ছুটে যাওয়ার ভয়ে শায়খে কামেলের সোহবত বিসর্জনের ফর্মুলা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তার সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। তাবলীগ জামা'আতের মেহনতের উদ্দেশ্যই তো হচ্ছে প্রতিটি মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার বানানো। যার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হচ্ছে তাবলীগ। এখন যদি তাবলীগে গিয়ে কারো মাঝে দ্বীনের পিপাসা জাগে আর সে কোন শায়খে কামেলের সোহবত এখতিয়ার করে তবে সেখানে আপত্তি থাকার প্রশ্নই আসে না। কত চিল্লা তিন চিল্লার সাথি কাজ থেকে শুধু সরেই যায় না বরং দ্বীন থেকেও সরে যায়, এদের নিয়ে অত ভয় নেই, যত ভয় কোনো সাথি শায়খের সোহবতে গমন করলে হয়ে থাকে। এ ভয় অযাচিত, অগ্রহণযোগ্য। কাজের সাথে মহব্বত রাখে, এমন শায়খ নির্বাচন করা হলে ব্যক্তিজীবনে দ্বীন-ঈমানের তারাক্কীর সাথে সাথে কাজেরও অগ্রগতি হবে। দাওয়াতের এই মোবারক মেহনত কোনো সংগঠন নয় যে কর্মী তৈরি ও কর্মী ধরে রাখার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সাথিদের নিছক পাঁচ কাজের কর্মী না বানিয়ে বরং প্রত্যেক ফরদকে পূর্ণ দ্বীনদার এবং পূর্ণ ঈমানদার বানানোই এই মেহনতের উদ্দেশ্য, যা উলামা-মাশায়েখের সোহবত ছাড়া সম্ভব নয়। (মালফুজাত, পৃ-৩৬)

সোহবতের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব

দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের শুরুলগ্ন থেকে যিনি এর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন তিনি হচ্ছেন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী (রহ.)। যিনি একদিকে ছিলেন খানকাহী জিন্দেগীর ধারক ও বাহক, অন্যদিকে ছিলেন তাবলীগের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর লেখা ফাজায়েলের কিতাব আজ সারা বিশ্বে পবিত্র কোরআনের পর সর্বাধিক পঠিত কিতাব হিসেবে স্বীকৃত। ফাজায়েলে তাবলীগের সপ্তম পরিচ্ছদে তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি দরখাস্ত করেছেন, তারা যেন কোনো আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করে। তাঁর সোহবতে যাতায়াত করে। হযরত শায়খ (রহ.) বলেন,

بالجملہ اس تحقیق کے بعد کہ یہ شخص اللہ والوں میں سے ہے اس کے ساتھ ربط کا بڑھا اسکی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا اس کے علوم سے منتفع ہونا دین کی ترقی کا سبب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بھی ہے

মোট কথা, তাহকীক করে সুন্নাতের অনুসারী আল্লাহওয়ালার সন্ধান পাওয়ার পর তাঁর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি, তাঁর খিদমতে বেশি বেশি হাজির হওয়া, তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হওয়া দ্বীনি তারাক্কী ও অগ্রগতির কারণ এবং নবীজি (সা.)-এর নির্দেশও বটে।

এরপর তিনি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত উল্লেখ করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সূরা আত্ তাওবাহ-১১৯)

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, সত্যবাদী বলতে এখানে মাশায়েখে সুফিদের বোঝানো হয়েছে। যখন কোনো ব্যক্তি তাঁহাদের খাদেম হয়ে যায় তখন তাঁহাদের তারবিয়াত ও বুজুর্গীর বদৌলতে সে উন্নতির উঁচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। শায়খে আকবার (রহ.) লিখেছেন, যদি তোমার কাজকর্ম অপরের ইচ্ছার অধীন না হয়, তবে তুমি সারা জীবন সাধনা করেও মনের খাহেশাত হইতে ফিরতে পারবে না। অতএব, যখনই তুমি এমন ব্যক্তি পেয়ে যাও, যাঁহার প্রতি তোমার অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়, তখনই তাঁহার খিদমতে লেগে যাও। তাঁহার সম্মুখে তুমি মুর্দার মতো হয়ে থাকো, যাহাতে তিনি তোমার ব্যাপারে যাহা ইচ্ছা তাহাই করতে পারেন এবং তোমার ইচ্ছা বলতে যেন কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। তাঁহার হুকুম পালনে জলদি করো, তিনি যে জিনিস হতে নিষেধ করেন উহা হতে বিরত থাকো, তিনি যদি পেশা গ্রহণ করতে হুকুম করেন তবে গ্রহণ করো; কিন্তু ইহা তাঁহার হুকুমের কারণে গ্রহণ করো; তোমার পছন্দের কারণে নয়, তিনি বসতে হুকুম করলে বসে পড়ো। অতএব ইহা অত্যন্ত জরুরি যে কামেল শায়েখ তালাশ করতে তুমি সচেষ্ট হও। তা হলেই তিনি তোমাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবেন। (ফাজায়েলে তাবলীগ সপ্তম পরিচ্ছেদ)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুবাল্লিগ ভাইদের প্রতি হযরতজির হেদায়াত-৪

মুফতী শরীফুল আজম

উলামায়ে দেওবন্দের নেগরানী

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচলিত পদ্ধতির গোড়াপত্তন যেভাবে উলামায়ে দেওবন্দের হাতে সম্পূর্ণ হয় ঠিক এর পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকায়ও ছিলেন উলামায়ে দেওবন্দ। সূচনালগ্ন থেকে আজ অবধি প্রায় শতবর্ষের কাছাকাছি সময়ব্যাপী উলামাদের নেগরানীতে চলে আসছে মুবারক এ মেহনত। এর পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছেন প্রথম হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)। তিনি নিজে একজন বিজ্ঞ আলেম ও সাহেবে নেসবত হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা নিজেকে সমকালীন উলামায়ে দেওবন্দের নেগরানীতে পরিচালিত করতেন। তাঁদের পরামর্শ-মতামত ছাড়া এই মেহনতের মাঝে এক কদমও অগ্রসর হতেন না। নিজেকে এই নেগরানীর ঊর্ধ্বে মনে করতেন না।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) উলামায়ে দেওবন্দের পরামর্শক্রমে দ্বীনি মাদরাসার ছাত্রদের দাওয়াতের মেহনতে সম্পৃক্ত করার কৌশল নির্ধারণ করেছিলেন। এসংক্রান্ত এক মজলিশে মশওয়ারা হযরতজির উদ্যোগে ৩ রবিউস সানী ১৩৬৩ হিজরী মোতাবেক ২৯ মার্চ ১৯৪৪ ইং রোজ বুধবার নিজামুদ্দিন মারকাজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে উপস্থিত ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামীম ক্বারী তৈয়্যব সাহেব, প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব, মাওলানা মুফতী শফী সাহেব, মাওলানা হাফেজ আব্দুল লতীফ সাহেব নাযেমে মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসা, মাওলানা এজাজ আলী সাহেব উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দ, মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী সাহেব, শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব। উক্ত পরামর্শে ফয়সালা হয় যে ১০ জন ছাত্র এবং দেওবন্দ ও সাহারানপুর থেকে একজন করে উস্তাদ নিয়ে জামা'আত বের করা হবে। এভাবে নিজামুদ্দিন তখন দেওবন্দ ও সাহারানপুরের উলামাদের পরামর্শ ও নেগরানীতে পরিচালিত হতো।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.), হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেবসহ ওই যামানার বড় বড় আলেমের কাছে বারবার ছুটে গিয়েছেন দারুল উলূম দেওবন্দে উলামা ও মাশায়েখের খেদমতে হাজির হয়ে ৬টি গুণের কথা যখন প্রস্তাব করেন, তখন একটি গুণ ছিল, একরামুল উলামা। মুফতী কেফায়াতুল্লাহ সাহেব দেখেশুনে বললেন, আপনি একরামুর উলামার পরিবর্তে একরামুল মুসলিমিন রাখেন। এতে বেশি ফায়দা হবে, হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.) আনন্দচিত্তে মেনে নিলেন তখন হযরত মুফতী সাহেব নিজ হাতে 'একরামুল উলামা' কেটে 'একরামুল মুসলিমিন' রেখে দিলেন। (সূত্র : রাহে ইতিদাল-৪০)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.) জীবনের শেষের দিকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের পুরো নকশা পেশ করার জন্য হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেবকে অনেক তোষামোদ ও খোশামোদ করে তিন দিনের জন্য নিজামুদ্দিন মারকাজে নিয়ে আসেন। তিন দিন পর্যন্ত হযরত মুফতী সাহেবকে কাজের পুরো তরতিব দেখানোর চেষ্টা করেন। এরপর মুফতী সাহেবকে নিয়ে আপন হুজরায় প্রবেশ করেন এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবেগের সাথে একখানা তলোয়ার মুফতী সাহেবের হাতে দিয়ে বলেন, হযরত! দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের এই যে পদ্ধতি আমি আপনার সামনে পেশ করলাম, যদি এর মধ্যে ভ্রষ্টতা থাকে তাহলে এই তলোয়ার দিয়ে আমার গর্দান কেটে ফেলুন! যাতে উম্মত ধ্বংস থেকে বেঁচে যায়, আর যদি এই মেহনত পদ্ধতি আপনার কাছে হক্ব মনে হয়, তাহলে আমাকে এ কাজের ব্যাপারে সহযোগিতা ও দু'আ করবেন। হযরত মুফতী কেফায়েতুল্লাহ সাহেব (রহ.) বললেন, যত দিন উলামা ও মাশায়েখের দিকনির্দেশনা নিয়ে, তাদের আদব-এহতেরাম ঠিক রেখে এই মেহনত করবে এবং তাদেরকে ইলমী মেহনত থেকে সরানোর চেষ্টা করবে না, বরং তাদের মেহনতের ব্যস্ততার ভেতরেই কিছু সময় তাদের থেকে নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তাদের দু'আ নিয়ে এ কাজ করতে থাকবে, তত দিন এ কাজ ও মেহনত ঠিকভাবে চলতে থাকবে এবং উন্নতি হতে থাকবে। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.) হযরত মুফতী সাহেবকে আশ্বস্ত করলেন যে, হযরত! এভাবেই (অর্থাৎ আপনার বাতলানো পদ্ধতিতে) কাজ চলতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ (রাহে ইতিদাল-৪১)

সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে উলামা-মাশায়েখের দিকনির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অতএব দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তি যদি উলামা ও মাশায়েখ থেকে নিজেকে বা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখে বা রাখার চেষ্টা করে এই ভেবে যে তারা তো তাবলীগী নন, সালওয়ালা উলামা নন, তাহলে এটা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় হবে এবং এটার দ্বারা নিজেদের মধ্যে রূহানী দুর্বলতাই বাড়বে, মেহনতে রূহানী শক্তি কমতে থাকবে। উলামা ও মাশায়েখ তো দ্বীনি ব্যস্ততা নিয়েই আছেন, দ্বীনের মেহনত করে যাচ্ছেন, পাশাপাশি যদি তাঁরা কোনো সময় সুযোগ পেয়ে এই পদ্ধতিতে কিছু সময় লাগাতে পারেন, তাহলে তো ভালো। না হলে, তাঁদের দু'আ এবং দিকনির্দেশনাই আমাদের এই মেহনতের মূল সম্পদ। উলামা ও মাশায়েখকে তাবলীগওয়ালা বানানো আমাদের কাজ নয়। এই কাজ করতে গিয়ে যদি উসূলের পাবন্দী না করে, তাদের আদব-এহতেরামের খেলাফ কাজ করা হয়, তাহলে তাদের সাথে দূরত্বই সৃষ্টি হবে, যা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের জন্য খুবই অশনিসংকেত বলে আমাদের মুরব্বিরা মনে করেন। (রাহে ইতিদাল-৪১)

ভুল সংশোধনের ফিকির :

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনয়ী হবে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ছিলেন তেমনি একজন বিনয়ী। নিজের ভুল নিয়ে সদা শঙ্কিত থাকতেন। যে কারো নজরে তাঁর কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে যেন সে তা সুধরে দেয় এই কামনাই করতেন হযরতজি (রহ.)। তিনি বলেন,

حضرت فاروق اعظمؓ حضرت ابو عبیدہؓ اور حضرت معاذؓ سے فرماتے تھے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنی نہیں ہوں، میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر رکھئے اور جو بات ٹوکنے کی ہو اس پر ٹوکئے (ملفوظات۱۲۲)

অর্থ : হযরত ফারুকে আজম (রা.), হযরত আবু উবায়দা (রা.) ও হযরত মুয়াজ (রা.)-কে বলতেন যে "আমি আপনাদের নেগরানীর মুখাপেক্ষী।" তদ্রূপ আমিও আপনাদেরকে বলছি যে দয়া করে আমার অবস্থার ওপর নজর রাখুন এবং সংশোধন করার মতো যে সকল বিষয় আছে তার সংশোধন করুন। (মালফুজাত-১২২)

মাশওয়ারাভিত্তিক মেহনত :

দাওয়াতের এই মোবারক মেহনতের মেরুদণ্ড বলা যায় মাশওয়ারার মতো একটি সুন্নাতকে। এই কাজের ভিত্তি রাখা হয়েছে মূলত মাশওয়ারার ওপর। কেউ যাতে নিজের কথা এককভাবে চালিয়ে দিতে না পারে, আর এটাই কোনো ভালো কাজ নষ্ট হওয়ার চোরা দরজা–তার জন্য মাশওয়ারার এত গুরুত্ব। প্রথম হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) সমকালীন উলামা-মাশায়েখের মাশওয়ারার ভিত্তিতে আমীর হিসেবে কাজ চালিয়ে গেছেন। তারপর দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) উলামা-মাশায়েখের মাশওয়ারার মাধ্যমে আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। এরপর তৃতীয় হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) একই পদ্ধতিতে আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। কেউই নিজের একক সিদ্ধান্তে আমীর দাবি করে লোকদের মানতে বাধ্য করেননি। অতএব মাশওয়ারার মূলনীতি উপেক্ষিত হলে দাওয়াতের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেন,

ہمارے اس کام میں اخلاص اور صدق دلی کیساتھ اجتماعیت اور شوریٰ م کی (یعنی مل جل کر اور باہمی مشورہ سے کام کرنے کی) بڑی ضرورت ہے اور اس کے بغیر برا خطرہ ہے(ملفوظات۱۲۲)

অর্থ : আমাদের এই কাজের মাঝে এখলাস, সততার সাথে সাথে একতাবদ্ধ থাকা এবং মাশওয়ারার মাধ্যমে মিলেমিশে কাজ করার গুরুত্ব অপরিসীম। আর তা না হলে বড় আশঙ্কা ও বিপদ আছে। (মালফুজাত, পৃ :-১৪৪)

দাওয়াত ও তাবলীগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হযরত শায়খ যাকারিয়া (রহ.), হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর তাবলীগের বিভিন্ন জিম্মাদার সাথিদের পত্র মারফত মাশওয়ারার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে লেখেন,

اہم بات یہ ہے کہ آپ کے تعلقات کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں شیطان کا سب سے بڑا حربہ جو دینی کاموں میں رکاوٹ کا سبب ہوا کرتا ہے وہ آپس کا اختلاف ہے، جماعتی کاموں میں اختلاف طبیعتوں اور رائے کا ہوا ہی کرتا ہے، آدمی کو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ جو میری رائے ہے وہ تو حق اور جو دوسروں کی رائے ہے وہ بالکل غلط ہے، دوسروں کی رائے کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے (سوانح ا/۲۸۹)

পরস্পর জোড়মিলের প্রতি লক্ষ রাখবে। শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যা দ্বীনের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে পরস্পরের মতানৈক্য। দলবদ্ধ যেকোনো কাজে মত ও পছন্দের

তারতম্য হওয়াটা স্বাভাবিক। নিজের মতকে শতভাগ সঠিক আর অন্যের মত বা রায়কে শতভাগ ভুল মনে করা অনুচিত। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা চাই। (সাওয়ানেহ ১/২৮৯)

বড় হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) বলেন,

مشورہ بڑی چیز ہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جب تم مشورہ کے لیے اللہ تعالی پر اعتماد کر کے جم کر بیٹھو تو اٹھنے سے پہلے تم کو رشد کی توفیق مل جائے گی۔

মাশওয়ারা খুবই গুরুত্ববহ, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে, যখন তোমরা মাশওয়ারার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করে একত্রে বসবে, তো উঠার পূর্বে সঠিক সিদ্ধান্তের তাওফীক মিলে যাবে। (মালফুযাত-১৩২)

হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বলেন,

کام کرنے والا اپنے جذبات کو قربانی کرتا رہے اور مشورے کے تابع رہے تو چلتا رہے گا ورنہ خطرہ ہے کہ ہٹ جائے گا، دین کے بارے میں دبنے سے دروازے کھلتے ہیں، ایسے موقع پر نفس یوں کہتا ہے کہ ناک نیچی ہوگئی، حالانکہ جو دبتا ہے اللہ تعالی اسکو بلند کرتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالی بلند کرتے ہیں اس کو کوئی نیچا نہیں کرسکتا۔

এই কাজের সম্পৃক্ত সাথিরা নিজের পছন্দকে কোরবানী করে মাশওয়ারার অনুগত হয়ে থাকলে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে, অন্যথায় লাইনচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে নিচু হয়ে থাকলে মর্তবা বৃদ্ধি পায়, নফস বলে যে, নাক কাটা গেল। আর বাস্তব হলো যে নিচু হয়ে থাকে আল্লাহ তা'আলা তাকে উঁচু করে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে মর্যাদা দান করেন কেউ তাকে নিচু করতে পারে না।

হযরতজি (রহ.) আরো বলেন,

اپنے آپ کو مشورے کے مطابق رکھنا ہے، اجتماعت اور بندھن رہے توڑ نہ ہو، ہمارا کام یہ ہے کہ مان کر چلیں۔

নিজেকে মাশওয়ারার অনুগত করা, জোড়মিল বজায় রাখা এবং তোড় সৃষ্টি হতে না দেওয়া, আমাদের কাজ হচ্ছে মেনে চলা। (সা. মা. এ.-৩/১৩৪)

জোড়মিল মুহব্বত :

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) মুসলমানদের ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, হুজুর (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নিজেদের সর্বস্ব বিলীন করে মুসলমানদের এক উম্মত হিসেবে তৈরি করে গেছেন। মুসলমান যদি এখনো এক উম্মত হিসেবে ঐক্যবদ্ধ থাকে তবে দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হয়ে তাদের একটি পশমও বাঁকা করতে পারবে না। উম্মতের জোড়মিলের পথে যবানকে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি কলেন,

امت کے بنانے اور بگاڑنے میں جوڑنے اور توڑنے میں سب سے زیادہ دخل زبان کا ہوتا ہے، یہ زبان دلوں کو جوڑتی بھی ہے اور پھاڑتی بھی ہے، زبان سے ایک بات غلط اور فسا کی نکل جاتی ہے اور اس پر لاٹھی چل جاتی ہے اور پورا فساد کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک ہی بات جوڑ پیدا کر دیتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ زبان پر قابو ہو، اور یہ جب ہوسکتا ہے جب بندہ ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ خدا ہر وقت ہر جگہ اس کے ساتھ ہے اور اس کی ہر بات سن رہا ہے (سوانح مولانا انعام الحسن ۱/۱۵۱)

উম্মতকে বানানো আর বিগড়ানো, জোড় আর তোড় সৃষ্টি করার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে যবানের। এই যবান দিলকে জুড়েও ফাড়েও। মুখ থেকে একটা ভুল কথা বা ঝগড়ার কথা বের হয়ে যায় আর সেটাকে কেন্দ্র করে লাঠিসোঁটা পর্যন্ত গড়ায় এবং বিশাল ফেতনা সৃষ্টি হয়। আবার একটি কথাই সকল ঝগড়া মিটিয়ে জোড়মিল, মুহব্বত সৃষ্টি করে দেয়। তাই যবানের নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন বান্দা এ কথা মনে করবে যে আল্লাহ সর্বদা সব জায়গায় তার সাথে রয়েছেন এবং তার প্রতিটি কথা শুনতেছেন।

হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বলেন,

اجتماع قلوب تقریروں اور تدبیروں سے نہیں ہوتا بلکہ یہ تو دوسروں کی خوبیاں دیکھنے اور اپنے عیوب دیکھنے سے ہوتا ہے خوبیاں دیکھنے کے لیے دوسرے کی ذات ہو اور عیوب دیکھنے کے لیے اپنی ذات ہو جو اس طرح چلے گا وہ ایک سراپا خوبی بن جائے گا۔

জোড়মিল, মুহব্বত বক্তৃতা বা তদবির দ্বারা সৃষ্টি হয় না। বরং এটা তো অন্যের গুণাগুণ দেখা আর নিজের দোষক্রটি দেখার মাধ্যমে হয়ে থাকে। গুণ অপর ভাইয়ের মাঝে খুঁজতে হবে আর দোষ নিজের মাঝে খুঁজতে হবে। এভাবে কেউ যদি চলতে পারে তবে সে একদিন আপাদমস্তক গুণে ভরপুর হয়ে যাবে। (সা. মা. এ-৩/১৮৯)

আমীর হওয়ার দাবি :

তিনি আরো বলেন,

دین کی جڑیں کاٹنے والی چیز انتشار ہے، میں امیر بنوں، میری بات چلے، میں اگرچہ حقیر فقیر لیکن میری بات کیوں نہیں مانی گئی، یہ سب انتشار پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، شیطان کا

سب سے بڑا ہتھیار انتشار اور افتراق ہے اجتماعت جتنی ہوگی کام کی جڑیں اتنی ہی مضبوط ہونگی (سوانح ۳/۱۹۱)

বিভেদ দ্বীনের শিকড় কেটে দেয়। আমি আমীর হব, আমার কথাই চলবে। অথবা আমি যদিও ছোট হই বা ফকীর হই কিন্তু আমার কথা শোনা হলো না কেন? এমন মনোভাবই বিভেদ সৃষ্টির উৎস। শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে বিভেদ ও দলাদলি। জোড়মিল যত বেশি হবে কাজের গোড়া ততই মজবুত হবে। (সা. মা. এ-৩/১৯১)

ব্যক্তিনির্ভর নয়, উসূলনির্ভর :

হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহ.)-এর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের এ আন্দোলনে এমন কোনো উপাদান যেন যুক্ত না হয়, যার কারণে মানুষ এটাকে তার ব্যক্তিসত্তা কিংবা তার সমকালের সাথে সম্পৃক্ত মনে করে বসতে পারে। কেননা তাহলে পরবর্তীতে সাধারণ মুসলমানগণ এ কাজের মেহনত মোজাহাদার হিম্মত ও সাহস হারিয়ে ফেলবে। এ কারণে কোনো পর্যায়েই তার নামে দাওয়াতের পরিচিতি হোক, এটা তিনি পছন্দ করতেন না। (দ্বীনি দাওয়াত) কিছুদিন পূর্বেও দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করনেওয়ালা মুরব্বিগণ হায়াত থাকা অবস্থায় নিজেদের নাম নিয়ে কোনো কথাবার্তা চালানো পছন্দ করতেন না। জীবিত থাকা অবস্থায় কেউ মুরব্বিদের কথা বলতে চাইলে তারা চাইতেন এভাবে বলা হোক, আমাদের বড়রা বলেন, কিংবা আমাদের বড়রা এটা চান। তাদের মনশা-ইচ্ছা এই ধরনের। মুরব্বিদের ইন্তেকালের পর তাদের নাম নিয়ে বলা হতো–বড় হযরতজি বলেছেন, কিংবা হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহ.) বলেছেন, শায়খুল হাদীস সাহেব (রহ.) বলে গেছেন ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে খুবই উদ্বেগের ব্যাপার যে আমরা নাম ধরে ধরে খুব বেশি কথা চালানোর চেষ্টা করছি। এটা আমাদের আকাবীরদের পছন্দের খেলাফ। কেননা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত কোনো শখসিয়াতের (ব্যক্তিবিশেষের) ওপর নির্ভর কোনো কাজ নয়। তাই কোনো ব্যক্তি যত বড়ই হোক, কাজকে তার দিকে নেসবত না করে বরং তাকে কাজের দিকে নেসবত করা চাই।

আমাদের বড় হযরতগণের মতে আরেকটি বিষয় খেয়াল করা দরকার, কোনো মসজিদ বা মারকাজে যদি আমীর সাহেব থাকেন, তাহলে তাঁর কদর করা, তাঁকে মেনে চলা উচিত। আর যদি শূরা থাকে তাহলে সব শূরাকেই কদর করা উচিত। যদি খোদপছন্দির কারণে কোনো মারকাজে বা মসজিদে কোনো সাথি বেশি কথা বলতে পারার কারণে বা কাজের ব্যাপারে বেশি ফিকির করতে পারার কারণে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে চায়, তাহলে আল্লাহ মাফ করুন এই মানসিকতার কারণে এখলাস নষ্ট হয়ে যাবে। আর এখলাস নষ্ট হয়ে গেলে কাজের রূহ বের হয়ে যাবে এবং মেহনতের নাম পড়ে থাকে। সুতরাং এখলাসের জন্য উসূলের পাবন্দী অত্যন্ত জরুরি।

এ জন্য আমরা যারা মেহনতের সাথে জড়িত আমাদেরও খোঁজখবর নেওয়া দরকার, কোন মারকাজে কতজন শূরা সদস্য আছেন এবং কে কে শূরা সদস্য আছেন? কাজের ব্যাপারে কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হলে ব্যক্তিগতভাবে শূরা সদস্যকে জিজ্ঞাসা না করে আহলে শূরাকে জিজ্ঞেস করা উচিত। এমন যেন না হয়, শূরার মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। সুতরাং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই হবে। তিনি যেটা বলবেন, সেটাই হবে। আমাদের বুঝতে হবে তিনি আমাদের শূরার একজন আমীর বা জিম্মাদার।

আর শূরার কারো কাছ থেকে এমন সিদ্ধান্ত চাওয়া হলে তাঁরও উচিত একক সিদ্ধান্ত না দিয়ে এ কথা বলে দেওয়া যে, ভাই আমি তো একজন শূরা সদস্য মাত্র। আমাকে এককভাবে সিদ্ধান্তের জন্য না জিজ্ঞাসা করে বরং আহলে শূরাকে জিজ্ঞেস করুন। কেবল তাহলেই দাওয়াতের কাজের নাহাজ (পন্থা) ঠিক থাকবে। আর যদি কোনো শূরা সদস্য দেখেন যে সবাই যখন আমার দিকেই বেশি মায়েল ঝোঁকা সুতরাং আমিও এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে অন্যদের পাশ কাটিয়ে যেতে থাকি। অচিরেই আমার মর্যাদা মানুষের অন্তরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাহলে দ্বীনের মেহনতের নামে এই ব্যক্তি দুনিয়ায় গ্রেফতার থাকবেন। কারণ দুনিয়া শুধু টাকা-পয়সা আর ধন-দৌলতের নাম নয়। বরং মর্যাদার মোহ বা প্রভুত্বলিপ্সাও দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বরং উলামা হযরতগণ বলেন, হোব্বে জাহ বা প্রভুত্বলিপ্সা হোব্বে মাল থেকেও মারাত্মক। মালের মহব্বত দিলের থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে সে নিজেকে দুনিয়াদার হিসেবে গণ্য করে না। বরং যারা মালের মহববতে আক্রান্ত সে তাদেরকে নিজের থেকে কম মর্যাদার মনে করে ফলশ্রুতিতে মনের অজান্তে সে কিবির বা অহংকারের ব্যধিতেও আক্রান্ত হয়। এই ধরনের পদস্খলনের ব্যাপারে এর কোনোটিই তার বিভিন্ন ধরনের মোজাকারা এবং বয়ানে ধরা

পড়ে না। অথচ প্রভুত্বলিপ্সা বা মর্যাদার মোহ এবং অহংকার এমন দুটি মারাত্মক রোগ, যা থেকে নিজেকে সুস্থ করার আগে তার অন্য অনেক উপকারী জিনিসই তার জন্য তেমন কোনো ফায়দা দেয় না।

দ্বীনের এই মোবারক মেহনত কোনো ব্যক্তি নির্ভর নয়, বরং এর তারাক্কী এখলাস এবং উসূলের ওপর জমে থাকার মাঝে নিহিত। হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) ব্যক্তিনির্ভরতার ক্ষতি উল্লেখ করে বলেন,

جب آدمی کی نگاہ اپنی ذات پر ہوتی ہے تو کام نہ ہونے پر مایوسی آتی ہے اور اگر خدا پر نگاہ ہوتی ہے تو کام نہ ہونے پر رجوع الی اللہ بڑھتا ہے، کام کے نہج کے صحیح ہونے کا فکر بڑھتا ہے، اور کام ہونے پر اپنے اندر خدا کا شکر پیدا ہوتا ہے۔(سوانح ۳/۱۷۹)

যদি মানুষ নিজের ওপর নির্ভর করে মেহনত করে তবে কাজ না হলে নিরাশ হয়ে যায়। আর যদি আল্লাহর ওপর ভরসা থাকে তাহলে কাজ না হলে আল্লাহর দিকে রুজু হয়, মনোযোগী হয় এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করার ফিকির বৃদ্ধি পায়। আর কাজ উদ্ধার হলে আল্লাহর শোকর পয়দা হয়। (সা. মা. এ-৩/১৭৯)

ফেতনার সময় কাজে মনোযোগ :

যেকোনো ফেতনা-ফ্যাসাদের সময় মেহনতকে এবং সাথিদেরকে ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্য মনোযোগের সাথে উসূল মেনে কাজে লেগে থাকার হেদায়াত প্রদান করে হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) বলেন,

سادگی کے ساتھ اپنے کو کام میں جمائے رکھیں گے تو ہماری بھی فتنوں سے حفاظت ہوگی اور کام کی بھی حفاظت ہوگی، فتنوں سے بچتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ ان اعمال کو کرتے رہیں گے تو فتنوں سے بچتے رہیں گے ورنہ تھوڑے سے فتنے کی طرف اگر جھانکیں گے تو فتنہ ہمیں اپنی طرف گھسیٹ لے گا (سوانح ۳/۱۷۹)

সাদাসিধাভাবে নিজেকে কাজে জমাতে পারলে আমাদের নিজেদেরও ফেতনা থেকে হেফাজত হবে এবং এই কাজও নিরাপদ থাকবে। ফেতনা থেকে দূরে থেকে মনোযোগের সাথে এ সকল আমলে জুড়তে থাকলে ফেতনা থেকে বাঁচতে থাকবেন। অন্যথায় ফেতনার দিকে সামান্য উঁকি মারলে ফেতনা আমাদেরকে টেনেহিঁচড়ে নিজের দিকে নিয়ে ছাড়বে। (সা. মা. এ-৩/১৭৯)

রাজনীতি থেকে দূরে থাকা :

তাবলীগের এই মেহনতের সাথে কারো সংঘর্ষ না হওয়া এবং বিশ্বের সকল দেশে গ্রহণযোগ্য হওয়ার পেছনে যে দর্শনটি কার্যকর ভূমিকা রেখে আসছে তা হচ্ছে নিজেদের রাজনীতি থেকে দূরে রেখে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে দ্বীনের ওপর ওঠানোর চেষ্টা করা। হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর দূরদর্শিতা ও ইলমী গভীরতার ফলে এই মুবারক মেহনতকে সব ধরনের বাধা-বিপত্তির ঊর্ধ্বে রেখে সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাবলীগের ছয় নম্বরকে এমনভাবে চয়ন করা হয়েছে দেশ বিভেদ ও সরকারের পালাবদল একে প্রভাবিত করতে পারেনি। বরং যেকোনো দেশে যেকোনো পরিবেশে নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে এই ছয় উসূল।

বড় হযরতজি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) রাজনীতির পরিবর্তে দাওয়াতের মেহনত চালিয়ে যাওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। এর বিপরীত পদক্ষেপকে তিনি ইসলামও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। তিনি বলতেন,

اس امت سے صدیوں سے سیاست کی قوت واہلیت سایب ہوچکی ہے، اب مدتوں صبر وضبط کے ساتھ دعوت کے اصول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں نظم واطاعت کی قابلیت اور قانون کی پابندی میں کام کرنے کی قوت پیدا ہوگی۔

বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে এই উম্মতের রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন কিছুকাল ধৈর্যধারণকরত দাওয়াতের মূলনীতির ওপর কাজ করে যাওয়া দরকার। এরপর মুসলমানদের মাঝে শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের যোগ্যতা এবং নিয়ম-কানুন মেনে কাজ করার সামর্থ্য সৃষ্টি হবে। (সা. মা. এ-৩/২৭২)

বড় হযরতজি (রহ.)-এর রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে দ্বীনদার লোকদেরকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টার পরিবর্তে ক্ষমতাসীনদের কাছে দ্বীন পৌঁছানোর চেষ্টা করা। যাতে করে তারা দ্বীনের প্রতি আগ্রহী হয়ে আখেরাতকে সামনে রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। এই দর্শনকে অনুসরণ করে দ্বিতীয় হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) এবং তৃতীয় হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) সারা জীবন রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রেখে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। আল্লাহর পথে এবং সত্যের পথে তাদের আহ্বান করতে থাকেন।

মুজাদ্দেদী তরীকা :

সত্য ধর্ম ইসলামের হেফাজত ও এর প্রচার-প্রসারকল্পে তিন হযরতজিই যে পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তা হচ্ছে মূলত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.)-এর দেখানো পথ ও পন্থা। এ ব্যাপারে হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) বলেন,

دین کا کام ایک تو ہے شاہ اسماعیل صاحب شہیدؒ کے طرز کا، لیکن اس میں دیکھو کہ ان کے ساتھ جو مجمع تھا وہ اولیاء کی صفات سے بھی آگے بڑھا تھا، صحابہ کرام سے مشابہت پائی جاتی تھی اور پھر ابتداء ہوئی بدعات اور فسق وفجور کے خلاف کوشش سے اور انتہاء کی سکھوں کے خلاف جہاد سے، آج اس وقت امت میں اس طرز کے کام کی استعداد نہیں ہے۔

দ্বীনের কাজের একটা হচ্ছে শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর পদ্ধতি। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন সেখানে তাঁর সাথে যেই বাহিনী ছিল তারা আউলিয়াদের স্তরের চেয়ে উর্ধ্বে ছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-দের সাদৃশ্য পাওয়া যেত। এরপর বিদ'আত ও বিভিন্ন নাফরমানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যাত্রা শুরু হলো আর শেষ হলো শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে। আজ উম্মতের মাঝে এই পদ্ধতিতে কাজ করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য নেই।

এরপর তিনি বলেন,

دوسرا کام ہے دین کا حضرت مجدد الف ثانی کے طرز پر کہ نیچے سے اصلاح کرتے آؤ، اور اگر نیچے اصلاح ہوجائے تو کم از کم درجہ یہ ہوگا کہ اوپر والوں کا شر انہیں میں محدود ہوجائے گا، اور آخر وہ بھی ترک شر پر مجبور ہوں گے، اگر حکومت سے شر آیا ہے تو عوام میں جن میں کوشش کر سکتے ہو ان کو شر سے خیر میں ڈال دو تو حکومت کا شر بھی ختم ہوجائے گا، جس طرح مجدد الف ثانیؒ نے حکومت کے علاوہ اس کے نیچے کو درست کرنا شروع کیا، آخر میں حکومت کا بھی شر ختم ہوگیا اور ان کی کوشش کے طفیل اکبر اور جہانگیر کی اولاد میں عالمگیر جیسے خادم شریعت پیدا ہوئے، ہمارا یہ کار تبلیغ حضرت مجددؒ کے طرز پر شر کو روکنا ہے اور خیر کی طرف موڑنا ہے۔

দ্বীনের কাজের আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.)-এর পদ্ধতি, অর্থাৎ নিচের থেকে এসলাহ বা সংশোধন করতে করতে আসা। যদি নিম্ন শ্রেণীর এসলাহ বা সংশোধন হয়ে যায় তবে ন্যূনতম ফায়দা এই হবে যে ওপরওয়ালাদের খারাবি তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। শেষে তারাও খারাবি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে। যদি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো খারাবি আসে তবে জনগণের মধ্য হতে যাদের ওপর চেষ্টা করা সম্ভব হয় তাদের ওই খারাবি থেকে ফিরিয়ে ভালোর দিকে নিয়ে আসা। তাহলে হুকুমতের খারাবিও খতম হয়ে যাবে। যেভাবে মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রহ.) সরকারের পরিবর্তে তার নিচের স্তরে শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। ফলে সরকারের খারাবিও একদিন দূর হয়ে গিয়েছিল। তাঁরই প্রচেষ্টায় বাদশাহ আকবর এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ঔরসে বাদশাহ আলমগীরের মতো শরীয়তের খাদেম জন্ম নিয়েছে। আমাদের এই তাবলীগের কাজ হচ্ছে মুজাদ্দেদ (রহ.)-এর পদ্ধতি অনুসারে খারাবিকে প্রতিহত করা এবং মঙ্গলের দিকে ফিরিয়ে আনা। (সা. মা. এ-৩/২৭৬)

শায়খ বান্নাকে পরামর্শ :

হযরতজি মাওলানা ইউসুফ (রহ.) মিসরের একসময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী সংগঠন আল-ইখওয়ানের প্রধান শায়খ হাসান আল-বান্নাকে পরামর্শ দিয়ে ছিলেন যে নিজেদের কর্মসূচিকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখুন। সরকারের সাথে কোনো প্রকার সংঘর্ষে জড়াবেন না। কিন্তু তিনি এই পরামর্শ গ্রহণ করেননি। এরপর ওই সংগঠনের পরিণতির ইতিহাস সকলের জানা আছে। মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী (রহ.) কারওয়ানে জিন্দেগী নামক গ্রন্থে লেখেন, যদি ইখওয়ান কিছুকাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে না জড়িয়ে দাওয়াত ও ইসলাহের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যেত, তবে গোটা আরব বিশ্বে ইসলামী ইনকিলাব সৃষ্টি হয়ে যেত এবং এক নতুন জীবন ফিরে আসত। নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমি জানতে পেরেছি যে শায়খ বান্না জীবনের শেষ মুহূর্তে সময়ের পূর্বে এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার জন্য বহু আফসোস করেছেন। তিনি পুনরায় দাওয়াতের মেহনতের সুযোগ পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেন। (সা. মা. এ-৩/২৯৭)

সরকারের সমর্থন বা বিরোধিতা না করা

হযরতজি মাওলানা এনামুল হাসান (রহ.) তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও আল্লাহপ্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে দুনিয়াব্যাপী যত দল বা সংগঠন দ্বীনের মেহনত করে যাচ্ছে তাদের উচিত সরকারের সমর্থন বা বিরোধিতা থেকে দূরে থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সংঘর্ষ বা বিরোধ সৃষ্টির কোনো ইস্যু তৈরি হতে না দেওয়া। (সা. মা. এ-৩/২৯৬)